আর্টিস্ট রবীন্দ্রনাথ

আর্টিস্ট রবীন্দ্রনাথ

ডঃ দিলীপ মালাকার

অনন্য প্রকাশন ৬৬, কলেজ স্ট্রীট (দ্বিতল)
কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ

মে, ১৯৬৩

প্রকাশক

হীরক রায়

অনন্য প্রকাশন

৬৬, কলেজ স্ট্রীট (দ্বিতল)

কলিকাতা—৭৩

মুদ্রাকর

শ্রীনিতাই ভুক্ত

দি জয় গুরু প্রেস

১৬এ, অবিনাশ ঘোষ লেন

কলিকাতা—৬

মূল্য : নয় টাকা

শ্রীমান দেবদীপকে

আর্টিস্ট শব্দটি বিদেশী। বহু বিদেশী শব্দের মতন আর্টিস্ট শব্দটিও এখন বাংলায় বহু প্রচলিত। সেই অর্থে এই বইয়ে আর্টিস্ট শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

ইউরোপে দুই দশক সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছি। সেই সময়ে ইউরোপে রবীন্দ্র-চিত্রকলার প্রদর্শনী এবং তার সমালোচনা সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া আরম্ভ করি। রবীন্দ্র-চিত্রকলা প্রথম প্রশংসা পায় ইউরোপের চিন্তাশীল মহলে। সে সম্পর্কে আমি প্যারিস, লণ্ডন, বার্লিন, মস্কো ইত্যাদি বড় বড় রাজধানীতে বিভিন্ন সময়ে তথ্য সংগ্রহ করি। সেই তথ্যের ভিত্তিতে এই বইয়ের সূত্রপাত।

বিদেশী সমালোচকদের কাছে রবীন্দ্র-চিত্রকলা কেন ভাল লেগেছে, দেশের বেশ কিছু চিন্তাশীল এবং আর্টিস্টকে কেন মুগ্ধ করেছে সেই সম্পর্কে তাদের মতামতও আমি লিপিবদ্ধ করেছি।

রবীন্দ্র-চিত্রকলা নিয়ে গত দুই দশকে বেশ কিছু প্রবন্ধ আমি লিখেছিলাম যুগান্তর, দেশ, অমৃত, মাসিক বসুমতী এবং আরও কয়েকটি পত্রিকায়। তার বেশ কিছু এই বইয়ে স্থান পেয়েছে।

এই বইয়ের কিছু তথ্য ও রবীন্দ্র-চিত্রকলার পুণর্মুদ্রণের অনুমতি দিয়েছেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ সুরজিৎ সিংহ, রবীন্দ্র-ভারতীর প্রদর্শনশালা এবং বিশ্বভারতীর কলাভবন। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ রইলাম।

ছাপাখানার ভূত এক প্রচলিত প্রবাদ, কিছু ভুল রয়ে গেছে ছাপায়। তার জন্যে পাঠকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে রাখছি। বইটি প্রকাশ করার জন্য শ্রীহীরক রায়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কলকাতা

ডঃ দিলীপ মালাকার

এই লেখকের—

জাতীয়তার বাণীমূর্তি হার্ডাব

Political and Social Writings of Benoy Sarkar

অচেনা দার্শনিক বিনোদ চক্রবর্তী

নেপোলিয়ণের দেশে

রহস্যময়ী প্যারিস

দুই জার্মানী

নানান দেশের নানান সমাজ

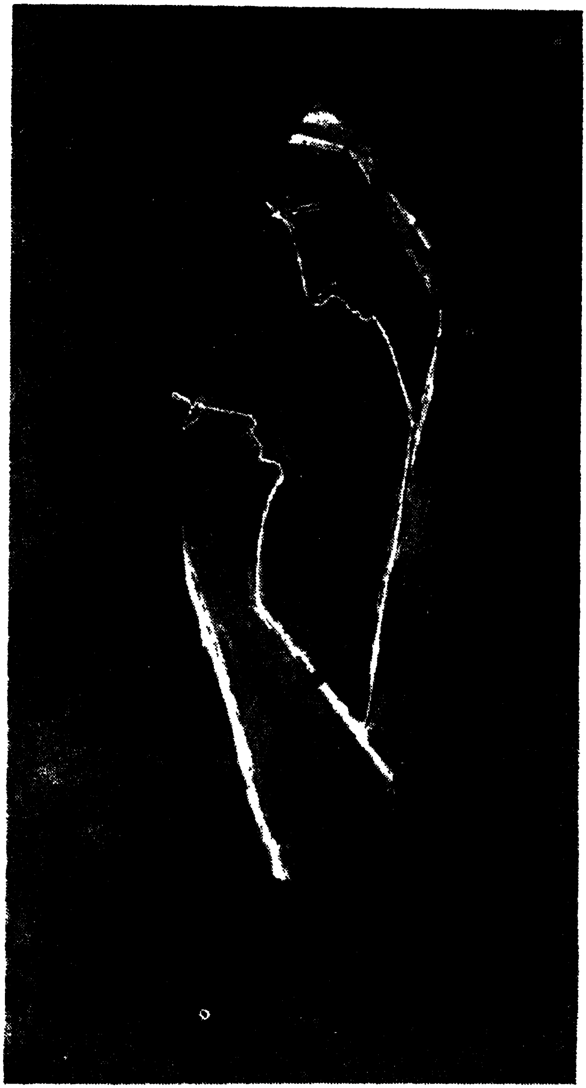
মস্কো থেকে মাদ্রিদ

চলো যাই দূর দেশে

আজকের রাশিয়া [নেহেরু পুরস্কার প্রাপ্ত]

রাশিয়া—ষাট ও সত্তর দশকে

ফ্লাইং সসার্স কি মহাকাশ যান ? (যন্ত্রস্থ)



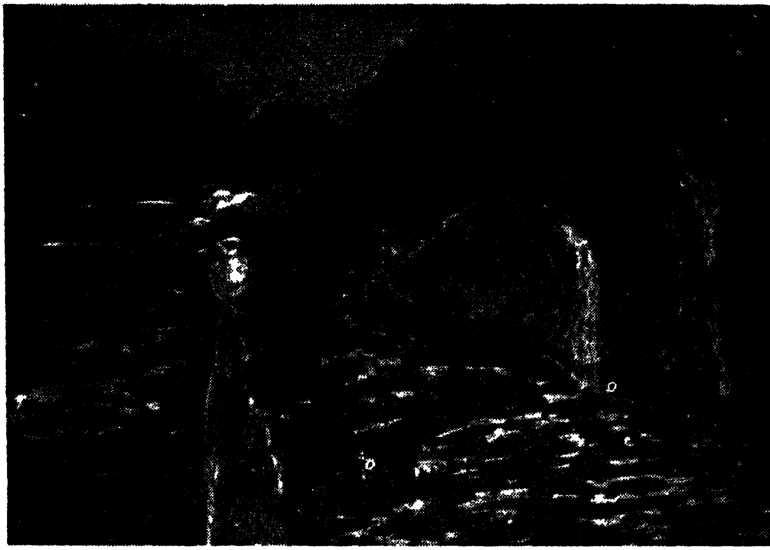
রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি



রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি



রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি

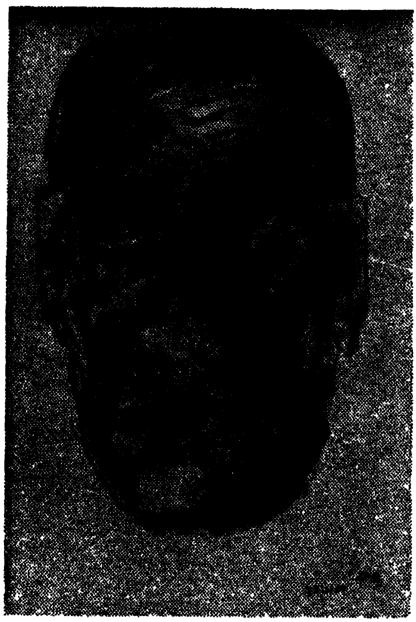


রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি





রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি



রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি



রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি



"ছবি আঁকতে পারি না"

রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলেছেন তাঁর জীবনস্মৃতিতে 'ছবি আঁকতে পারি না'। ছবি তিনি আঁকতেন এবং ভালই আঁকতেন। সে যুগে তার মূল্যায়ন হয় নি বলেই তাঁর মনে জমে ছিল অভিমান। শেষকালে রবীন্দ্রনাথ সেই ক্ষোভ-অভিমান বহুবার প্রকাশ করেছেন বহু চিঠিপত্রে। মনের কথা সবার কাছে বলা যায় না। তাই তিনি সবাইকে বলতে পারতেন না। তাছাড়া রবীন্দ্র-চিত্রকলা বোঝার মতন মানসিকতা সে যুগে সবার ছিল না। যে কজনের ছিল সে কজনের কাছে তিনি মনের কথা জানিয়েছেন বহুবার বহু চিঠিপত্রে।

কবি রবীন্দ্রনাথের কল্পনার রচনা কলায় বহু সাহিত্যরসিক পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করেছেন। মানুষ মাত্রেই স্বপ্ন দেখে। নানা সময়ে নানা প্রশ্ন জাগে। প্রকৃতির দৃশ্যান্তরে মনের কলমে বা চোখের তুলিতে সবাই তা ধরে রাখতে পারেন না। কিন্তু যারা তা পারেন কলমের ডগায় ধরে রাখতে তারা হন সাহিত্যিক আর যারা তুলিতে ধরে রাখেন ক্যানভাসে তারা হন আর্টিস্ট।

যে-যুগে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন সে-যুগে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চিত্রকলা সম্বন্ধে আমাদের জনসাধারণের মনোভাব কি ছিল ; বিংশ শতাব্দীর দুই দশকে যখন রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকতে শুরু করেন, তখন ভারতীয় চিত্রকলার দৌড় রাজা-রানী, পৌরাণিক কাহিনী আর দেব-দেবতা পর্যন্ত। বাস্তব-জীবনের ঘটনা নিয়ে ছবি আঁকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার চল তখন হয় নি। দু-একজন এক-পা এগিয়ে দু-পা পিছিয়ে গেছেন বিরূপ সমালোচনার ভয়ে। ঠিক সেই যুগে

কবিতায়-গল্পে-উপন্যাসে জীবনের বাস্তবতা বা রিয়ালিজ্‌ম্‌ নিয়ে সাহিত্যের আসরে অগ্রদূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বহু কুসংস্কার বাধা-বিঘ্ন ডিঙ্গিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে হয়েছিল তাঁকে। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। সে ইতিহাস নিয়ে বহু লেখা-লেখি হয়েছে। প্রথম জীবনে সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে বহু বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নৃত্যনাট্য নিয়েও তাঁকে কম কথা শুনতে হয় নি। রবীন্দ্রসঙ্গীত এখন জনপ্রিয়তার শিখরে কিন্তু এমন দিন গেছে যখন প্রাচীনপন্থীরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের নামে নাক সিঁটকাতেন। এখন ঘরে-ঘরে যত রবীন্দ্রসাহিত্য বা সঙ্গীতানু-রাগী দেখা যাচ্ছে তখন তত ছিল না। রবীন্দ্র-সাহিত্য-সঙ্গীত সমীক্ষা চালালে দেখা যাবে, লিখতে-পড়তে জানেন এমন বাঙালী বাড়িতে অন্ততঃ একখানা রবীন্দ্রনাথের বই এবং গানের রেকর্ড রয়েছে। কিন্তু সত্যিকারের ক'জন রবীন্দ্র অনুরাগীর ঘরে অন্ততঃ একখানা রবীন্দ্র চিত্রকলা দেখা যাবে? এ নিয়ে সমীক্ষা করে দেখা গেছে বহু রবীন্দ্র-সাহিত্য-সঙ্গীত অনুরাগী এখন পর্যন্ত আর্টিস্ট রবীন্দ্রনাথকে ঠিক পুরো-পুরি গ্রহণ করতে পারছেন না। কিন্তু কেন?

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতাবাদ আনতে সাহিত্যিকদের বহু বাধা অতিক্রম করে আসতে হয়েছে। ভারতীয় আর্ট জগতে সেই বাধা অতিক্রম পর্ব এখনও শেষ হয় নি। বরং বলব তার যাত্রা হাল আমলের।

ঠাকুর-দেবতা, পৌরাণিক কাহিনী ও রাজা-মহারাজাদের দিয়ে ছবি আঁকা অথবা পারশ্যের মিনিয়েচার ঢঙের ছবি আঁকা মুখ্য ছিল বিংশ শতাব্দীর দুই দশক পর্যন্ত। চিরাচরিত ক্ল্যাসিক ও অকাডেমিক ঢঙ্‌ বদলে নতুন প্রথায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাটা বহু শিল্পী ভাবতেও ভয় পেতেন। সেই প্রচলিত নিয়ম-কানুন ভেঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাস্তব জীবনের রিয়ালিস্টিক কিংবা এক্সপ্রেসানিস্টিক ছবি আঁকতে গিয়েই যত গোল বাধিয়েছেন। তিনি যদি তখন গতানুগতিক প্রথায় রাজা-রানী,

দেব-দেবীর ছবি আঁকতেন তাহলে বোধহয় তিনি বহু হাততালি পেতেন। বিপ্লবী-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ সে ধরনেব সস্তা জনপ্রিয়তায় সায় দিতে পারেন নি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ আর বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ভারতবর্ষ জুড়ে স্বদেশী বন্যার ঢল নেমেছে। অনেকে তার নাম দিয়েছিলেন রেনেশাঁস-পর্ব। প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগের পুনঃপ্রবর্তনের মানসিকতা তখন সর্বত্র। শিল্প-সাহিত্য থেকে শুরু করে পোশাকে চাল-চলনে রেনেশাঁসের প্রভাব ফুটে উঠেছে। শিক্ষা ও রাজনীতিতে তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে বেশ কিছু কাল আগেই। এই দলে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নেতা রবীন্দ্রনাথ। কত স্বদেশী গানই না তিনি তখন রচনা করেছেন।

ঠিক সেই যুগে ভারতীয় আর্ট জগতে ক্ল্যাসিক প্রথায় আঁকা ছবির জয়-জয়কার। তার কিছু আগে অজন্তা-ইলোরা শৈলীর আবির্ভাব। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন যার পুবোধায়। ওদিকে রবি বর্মার ক্লাসিক ধর্মী আর্ট সবাব চোখে-চোখে। ঠাকুববাড়ির প্রেরণায় বাঙালী চিত্র-শিল্পীবা ভারতীয় রেনেশাঁস নিযে মেতে বয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে হেমেন মজুমদার ইত্যাদি শিল্পীবা ক্লাসিক ঢঙ্‌যে ছবি এঁকেছেন। সেটা পুরোপুবি স্বদেশী যুগ। বিদেশী প্রথায় আঁকা, সে কথা ভাবাই যায় না।

আর্ট জগতে বিদ্রোহ বা বিপ্লব আসে ইউবোপে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। আর নতুন-নতুন ইজম্ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তখন ইউরোপে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে। তার ঢেউ কিন্তু তখন ভারতে এসে আছড়ে পড়ে নি। তার প্রভাব তখন ভারতীয় শিল্প-জগতে বিশেষ প্রবেশ করে নি। সম্ভবতঃ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার প্রভাবে খানিকটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে তরুণ রবীন্দ্রনাথ তখন ইউরোপে। তিনি চোখ-কান খুলে চলতেন। ইউরোপীয় আর্ট-জগতের নানা ইজম্ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বার ছয়েক ইউরোপ-আমেরিকা গেছেন এবং থেকেছেন দীর্ঘকাল ধরে। তারপরেই রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করলেন তাঁর নিজের চিত্রকলায় রিয়ালিস্টিক এক্সপ্রেশানিস্টিক পদ্ধতি। ভারতীয় আর্ট জগতে আধুনিকতাবাদীদের মধ্যে অগ্রদূত রবীন্দ্রনাথ, অন্য কেউ নন।

এসম্বন্ধে বৃটিশ চিত্র-সমালোচক এবং ঐতিহাসিক মিঃ ডব্লু. জি. আর্চার তাঁর প্রখ্যাত বই 'ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড মডার্ণ আর্ট' (লণ্ডন ১৯৫৯) বইয়ে লিখেছেন, "ভারতবর্ষে আধুনিক আর্ট নিয়ে কেউ যদি কিছু সৃষ্টি করে থাকেন তা হল রবীন্দ্রনাথ। কবির জন্ম ১৮৬১ সালে। আর্ট সম্বন্ধে কোন কেতাবী শিক্ষা গ্রহণ করেন নি রবীন্দ্রনাথ এবং ১৯২৮ সাল পর্যন্ত তিনি গভীর ভাবে চিত্রাঙ্কনে মন দেন নি। প্রথম যৌবনে তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিঃসঙ্গভাবে কাটাতেন। সেটা ১৮৯০ সাল। একটা খাতায় প্রচুর আঁকি-বুকি করেছেন। শিল্পী মুকুল দে তাঁর স্মৃতি মন্থন করে লিখেছেন, '১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসের এক দুপুরে ঠোঁটে রহস্যময় হাসি। তিনি আমায় তাঁর সঙ্গে শান্তিনিকেতনের বাড়ির ওপরের ঘরে যেতে নির্দেশ দিলেন। ওপরের ঘরে গিয়ে কবি চামড়ায় বাঁধানো একটা খাতা খুলে আমাকে দেখতে দিলেন। বাঁধানো খাতার পাতায়-পাতায় নানা মুখ ও মানুষের স্কেচ্। অনেক স্কেচের মধ্যে ছিল কবি পত্নীর ছবি। সম্ভবতঃ আর্টিস্ট রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি-গুলোর মধ্যে ওগুলোই প্রাথমিক।' চার বছর পরে অর্থাৎ ১৯১০ সালে কবির সঙ্গে মুকুল দে গিয়েছিলেন রামগড় পাহাড়ে। এই ভ্রমণে কবি তাঁর পুত্রবধূর কয়েকটি ছবি আঁকেন। মুকুল দে পরে আবার লিখেছেন, '১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে কলাভবন প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন কবি একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা চালু করলেন। এই চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় কবি স্বয়ং যোগ দিয়েছেন, ছবি এঁকেছেন এবং বিচারকদের মধ্যে ছিলেন একজন'।" —ইণ্ডিয়া এণ্ড মডার্ন আর্ট, পৃঃ ৪৯

১৯৩০ সালে লণ্ডনের 'রয়েল ইণ্ডিয়া সোসাইটি'তে বক্তৃতা দেবার সময়ে অনেকে রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কবি আপনি কি ছবি আঁকা ছোটবেলায় শুরু করেন?' উত্তরে কবি তাঁদেব বলেন—"আমি শুধু কথা শিল্পটা শিখেছিলাম, রেখাঙ্কনে নয়। জন্ম থেকেই আমার ছন্দজ্ঞান বিকাশ হতে থাকে।

ছোটবেলায় যখন কবিতা, তার ছন্দ এবং বিশেষ কবে সংস্কৃত কাব্য বুঝতাম না তখন কিন্তু সেগুলো আমার ভাল লাগত। আমার মনকে তৃপ্তি দিত। সেই থেকে কবিতা লিখতে শুরু করি। কেন জানি না শব্দেব ঝর্ণা আমায় মোহিত করত। আমার মনে হয় শব্দগুলোতেই তাব অর্থ নিহিত থাকে। এমনি ভাবে দেখলে দেখা যাবে শব্দগুলো ছন্নছাড়া, নিবস। যেন কোনো প্রেবণা আনে না। কিন্তু যখনই শব্দগুলো হয় ছন্দোবদ্ধ, রূপ নেয বাস্তবতায়, তখনই মন হবে সৃজনশীল। সব সময়ে বাক্যগুলোব অর্থ খোঁজাব মানে হয় না। প্রত্যেকটি বাক্যেব বয়েছে প্রতিবেদন যা গ্রহণযোগ্য; সেগুলো বাস্তব, সেগুলো মূল্যবান। বাস্তব বলেই তাব রয়েছে শেষ পবিণতি আব চিবায়ত গুণাবলি।" —ইণ্ডিয়া এণ্ড মডার্ন আর্ট, পৃঃ ৫০

রবীন্দ্রনাথ তাঁব নিজের চিত্রকলা সম্বন্ধে বলেছেন—"আমাব আঁকা ছবিগুলো রেখাব ছন্দ। কেউ যদি হঠাৎ ছবিগুলোব স্বীকৃতি দিতে চান, তবে তিনি দেখবেন ওতে বয়েছে ছন্দেব বৈশিষ্ট্য। মানে বা ব্যাখ্যা খুঁজতে গেলে তিনি খেই হারিয়ে ফেলবেন। শৈশবে আমি যে শিক্ষা পেয়েছি তা হল ছন্দেব শিক্ষা, চিন্তায় ছন্দ আর শব্দের ছন্দ।"

—১৯৩০ সালে রবীন্দ্র চিত্রকলা প্রদর্শনীর পুস্তিকার ভূমিকা থেকে।

ববীন্দ্রনাথ সারা জীবনে কত ছবি এঁকেছেন তার সঠিক হিসেব নেই। তবে বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী, অকাডেমি অব ফাইন আর্টস ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে ববীন্দ্র চিত্রকলার সংখ্যা আড়াই হাজারের মতন। তিনি প্রথম কবে ছবি আঁকা শুরু করেন তাই নিয়ে বহু মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেন মধ্য বয়সে, কেউ বলেন কৈশোরে।

একটি তথ্য থেকে জানা গেছে যে রবীন্দ্রনাথ অতি শৈশবে অঙ্কন-শিক্ষা শুরু করেন। শুধু রবীন্দ্রনাথ নন ওই সময় ঠাকুর পরিবারের অনেকেই ছবি আঁকা শিখতেন। এ সম্বন্ধে শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তথ্য প্রকাশ করেছেন বছর ত্রিশেক আগে। ১৯৪৫ সালে 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার ২য় খণ্ড ৩য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫২-তে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথের ড্রইং শিক্ষক' প্রবন্ধে শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন—'রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ ভাগে চিত্রাঙ্কন কার্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন বলিয়া সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু বাল্যকালে যে তাঁহার ড্রইং শিক্ষক ছিলেন তাহা বোধহয় অনেকেই জানেন না। সম্প্রতি আমাদেব পাবিবারিক পুরাতন কাগজের মধ্যে রক্ষিত পাবিবারিক হিসাবের ৩১ আষাঢ় ১২৮২ তারিখের রোকড়ের পৃষ্ঠা হইতে সেই তথ্যটি পাওয়া যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ জীবনী লেখকগণেব অবগতির জন্য এবং ইহাব ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে বিবেচনায় রোকড়েব উক্ত অংশটি অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

উক্ত অংশের বোকড়েব নকল—

বি তারিখ—৩১ আষাঢ় ১২৮২

বুধবার—১৪ জুলাই—১৮৭৫

জমা—

বাজে খাতে জমা—৩০ টাকা

মাঃ সরকারি তহবিল

দঃ সোম রবিবাবুদিগের

ড্রইং শিক্ষক মাষ্টারেব

সাবেক বেতন ৫ টাকা হিঃ ৩০ টাকা পাওয়া গেল।

কোং—৩০ টাকা

৩০ টাকা।

—রবীন্দ্র ভারতী প্রদর্শনশালার সৌজন্যে প্রাপ্ত, মূল হিসাবের খাতাটি ওখানে রক্ষিত আছে।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তের-চৌদ্দ বছর বয়সে ছবি আঁকা শিখতে শুরু করেন। তারপর ১৮৭৯ থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে তিনি যখনই বেড়াতে যেতেন বা পদ্মার বুকে বোটে চড়ে বেড়াতেন তখন স্কেচ্ বই সঙ্গে নিতেন। তাতে তিনি প্রচুর ছবি এঁকেছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি ইন্দিরা দেবীকে চিঠিতেও লিখেছিলেন। ছিন্নপত্রাবলীতে তার উল্লেখ আছে। তবে সিরিয়াসলি তিনি ছবি আঁকা শুরু করেন নোবেল পুরস্কারের আগেই। তারই কিছু ছবি তিনি দেখিয়েছিলেন লণ্ডনে ১৯১২ সালে শিল্পী রোটেনটাইনকে। ১৯২০-এর পর তিনি নিয়মিত আঁকতে থাকেন। তারই ফলশ্রুতি হল ১৯৩০ সালে বিদেশে চিত্র প্রদর্শনী। তখন কবির বয়স উনসত্তর।

রবীন্দ্রনাথের আঁকা চিত্র প্রদর্শনী প্রথম হয় প্যারিসে ১৯৩০ সালের মে মাসে। ওই বছরের জুন মাসে প্রদর্শনী হয় বার্মিংহাম ও লণ্ডনে। তারপর জুলাই মাসে বার্লিনে ও মিউনিখে। আগস্ট মাসে হয় শার্লোটেনবুর্গ ও জেনেভায়। সেপ্টেম্বর মাসে হয় মস্কোতে। নভেম্বর মাসে হয় নিউইয়র্ক আর ফিলাডেলফিয়ায়। কলকাতায় গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে রবীন্দ্র চিত্রকলার প্রদর্শনী হয় ১৯৩২ সালে। এবং সেটাই এদেশে প্রথম। প্যারিসের প্রদর্শনীর ক্যাটালগে তৎকালীন ফরাসী সাহিত্যিক কাউণ্টেস্ আনা দ্য নোয়াই লিখেছিলেন, "রবীন্দ্র চিত্রকলা যেন স্বপ্ন জগতের। প্রতিটি রেখা নিখুঁত। ছবিগুলো ভিন্ন জগতে পৌঁছে দেবে।"

রবীন্দ্রনাথের শৈশবে ঠাকুরবাড়িতে ছবি আঁকার চর্চা হত। ঠাকুরবাড়ির অন্যান্যদের মতন রবীন্দ্রনাথও ছবি আঁকতেন। এ সম্বন্ধে ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী তাঁর 'রবীন্দ্রস্মৃতি'তে বলেছেন—"কাব্যের সঙ্গে শিল্প স্বভাবতঃই জড়িত। কিন্তু রবিকাকা অনেক বয়সে শিল্প-লক্ষ্মীর আরাধনা শুরু করেছেন, কাজেই আমার সে বিষয়ে ছেলে-বেলাকার বিশেষ কোন স্মৃতি নেই। তবে তাঁর যে আঁকবার হাত আছে, তার পরিচয় আমরা ছেলেবেলা থেকেই পেয়েছি। জ্যোতিকাকা

মশায়ের মতো পেনসিলে প্রতিকৃতি আঁকায় পারদর্শী না হলেও আর অত খ্যাতি অর্জন না করলেও তিনি পেনসিলে কারো-কারো ছবি এঁকেছেন বলে মনে পড়ে। ১৮৯২ সালে আমরা দীর্ঘদিন ধরে সিমলা পাহাড়ে থাকি। সেই সময় কলকাতার ৫ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর গলির সঙ্গে সিমলার উড ফিল্ড বাড়ির যে হেঁয়ালি চিত্র বিনিময় চলত তার নমুনা এখনও রবীন্দ্র সদনে আছে। ববিকাকার হাতেরও কতকগুলি হেঁয়ালি চিত্র এতে আছে। হেঁয়ালি রচনাতেও তাঁব স্বাভাবিক মৌলিকতা যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি এইসব পেনসিলে আঁকা ছবিতেও তাঁর ভবিষ্যৎ চিত্রকলা-সাধনার সংকেত ধবা পড়ে।

জোড়াসাঁকোব ৫ নম্বর আব ৬ নম্বর দুই বাড়িব সবস্বতী চিত্রকলা আর সঙ্গীতকলায় দুই দিক ভাগ করে নিয়েছিল। ৬ নম্বর বাড়িতে যেমন প্রতি ছেলেমেয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে একটা গান গাইতে পারতেন না তা নয়, তেমনি ৫ নম্বরেও প্রত্যেকেই ছোটবেলা থেকে রেখার আঁচড় আব বঙেব পোঁচ দিতে পারতেন। রবিকাকা সম্বন্ধেও একথা খাটে।"

রবীন্দ্রনাথের 'পকেট বই' (১৮৮৯)-তে লুকিয়ে আছে ববীন্দ্র চিত্র-কলার প্রথম যুগের কিছু স্বাক্ষর। 'পকেট বই'তে আছে তাঁর বচিত বহুগান, কবিতা, ছবি, ডায়েরী ও নানা হিসেবপত্র। ১৮৮৯ সালে কবির বয়স আব কত; আটাশ হবে। সে সময়ে তিনি কাজেব অবসরে পাতার আনাচে-কানচে কাটিকুটি করে ছবি আকতেন। জমিদারী হিসেবের খাতায় লেখায় ও বেখায় ভরে উঠত। হিসেব লিখতে গিয়ে কাটাকুটির মাঝে এঁকেছেন ছন্দোময়ী কৃষ্ণাঙ্গী। আরেক পাতায় হিজিবিজির মাঝে দুটি নারীর মুখ এঁকেছেন।

"আমি চিনিগো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী
তুমি থাক সিন্ধু পারে—ওগো বিদেশিনী
তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে, তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে
তোমায় দেখেছি হৃদি মাঝারে—ওগো বিদেশিনী।"

ওই লেখার শুরুতেই প্রথম লাইন কেটে তিনি এঁকেছেন এক পুরুষের মুখ। পাতার কোণে এঁকেছেন সুন্দর নক্‌শা।

রবীন্দ্র চিত্রকলার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, কবি শেষ জীবনে ছবি আঁকার কাজে ডুবেছিলেন। যেন তখনই তিনি ছবি আঁকা শুরু করেন। আসলে জীবন শিল্পী রবীন্দ্রনাথ শৈশবেই ছবি আঁকায় হাত পাকাতে শুরু করেন। সে সম্বন্ধে তাঁর বহু নিকটাত্মীয় তাঁদের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বহু জায়গায় বলেছেন—প্রথম যৌবনে যে তাঁর আঁকার খাতা ছিল সে কথাও আমরা জেনেছি।

রবীন্দ্র চিত্রকলায় বিদেশী প্রভাব রয়েছে। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিদেশী অঙ্কন শৈলী রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করতেন। সে কথাও কবি কয়েক জায়গায় বলেছেন। তাই বলে ভারতীয় শিল্পশৈলীকে অবজ্ঞা করতেন না। বরং তিনি ভারতীয় অঙ্কনশৈলীর পূর্ণ মর্যাদা সহকারে সম্মান দিয়েছেন। সে কথা তিনি বহু জায়গায় লিখেছেন। যে কোনো চিত্রশিল্পী তাঁর অঙ্কন শিক্ষার প্রথম ধাপে ক্ল্যাসিক বা অকাডেমিক নিয়মে হাত পাকাতে শুরু করেন। যখন হাত পেকে যায় তখন তিনি বিভিন্ন ইজমের পথে ঝোঁকেন। রবীন্দ্রনাথের বেলায়ও সেই কথাই খাটে।

ছিন্নপত্রাবলীতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আজ তোর কাছ থেকে কতকগুলো খবরের কাগজের কাঁচি-ছাঁটা টুকরো পাওয়া গেল। কোথায় প্যারিসের আর্টিস্ট-সম্প্রদায়ের উদ্দাম উন্মত্ততা আর কোথায় আমার কালীগ্রামের সরল চাষী প্রজাদের দুঃখদৈন্য নিবেদন।"

—১১১ নং চিঠি, কলকাতা ২১ আগস্ট ১৮৯৩, রবীন্দ্ররচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার একাদশ খণ্ড, ১৯৬১, পৃষ্ঠা ১২৪

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ত্রিশ-বত্রিশ। কাল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। তখন রবীন্দ্রনাথ দেশী-বিদেশী আর্ট নিয়ে মগ্ন। নেহাৎ অবসর বিনোদন বা বিলাসিতা নয়। বিদেশী আর্টের নবযুগের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ যতখানি বিদেশী আর্ট সচেতন ছিলেন তার চেয়েও বেশী

ছিলেন ভারতের চিরায়ত আর্ট নিয়ে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "রবি বর্মার ছবি দেখতে দেখতে সমস্ত সকাল বেলাটা গেল। আমার সত্যি বেশ লাগে। হাজারই হোক, আমাদের দিশি বিষয় এবং দিশি মূর্তি ও ভাব আমাদের কাছে বা কতখানি, এই ছবিগুলো দেখলে তা বেশ বোঝা যায়। অনেকগুলো ছবির হাত-পা, দেহের পরিমাণ খুব অসমান আছে, কিন্তু মোটের ওপর সব শুদ্ধ জড়িয়ে খুব মনের ভেতর প্রবেশ করে। তার প্রধান কারণ, আমাদের মনটা চিত্রকরের সহযোগিতা করতে থাকে। সে কি বলতে চাচ্ছে আমরা আগে থাকতে বুঝে নিই—তার চেষ্টাটুকু দেখলেই বাকিটুকু পূরণ করা খুব সহজ. তার জন্যে বেশি ক্ষমতার দরকার করে না, কিন্তু যখন ভেবে দেখা যায় কোনো বিষয়ে একটা স্পষ্ট কল্পনা করা কতই শক্ত মনে আমাদের ছবিটা উদয় হয় তা প্রায়ই আধা-আধি মোটামুটি গোঁজামিল দেওয়া—কিন্তু ছবি আঁকতে গেলে একটি সামান্যতম রেখা পর্যন্ত ছাড়বার জো নেই।"

—ছিন্নপত্রাবলী, ২৪ নং চিঠি শিলাইদহ ৮ মে ১৮৯৩, রবীন্দ্ররচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৬১ একাদশ খণ্ড, পৃঃ ১১৬

রবীন্দ্রনাথ খাঁটি স্বদেশী। শিক্ষায় দীক্ষায় তো বটেই ছবি আঁকার ব্যাপারে তার ব্যতিক্রম হয় নি। অঙ্কন শিক্ষায় ও চর্চায় ঠাকুর-বাড়ির স্বদেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল। চিত্রাঙ্কন শিক্ষায় ও চর্চায় স্বদেশী ভিত্‌টা গড়ে ওঠে বহু পূর্বে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আর্টে স্বদেশী ঐতিহ্য দিয়ে শুরু করে আমার ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ। আমি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে দেখতাম ওর কাজ। ওর কাজ দেখে নিজেকে খাটো মনে হত, যদিও আমি জানতাম বিধাতা আমায় সাহিত্যের গণ্ডি পেরিয়ে যাবার অনুমতি দেবেন না।' —চিত্রলিপি-২ ; ১৯৩০

রবীন্দ্র চিত্রকলা সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। এক-একজন এক-এক রকমের ব্যাখা করেছেন। কবি স্বয়ং তার আর্ট সম্বন্ধে বলেছেন—"অধিকাংশ মানুষই তার নিজের চোখের ব্যবহার জানে না বা করতে চায় না। সে তার ছোট পরিধির মধ্যেই ব্যস্ত। আর্টিস্ট তার প্রাণের

তাগিদে সাড়া দেয়, সবাইকে সে তার সুখ-দুঃখের অনুভূতির অংশীদার করতে চায়। আর্টিস্ট গায় না গান, সে তো কাউকে নীতিবাদ শোনাতে চায় না। তার সৃষ্টিই তার বাণী। সে যেন বলতে চায় : দেখ এই আমি, এই আমার কাজ।

—টেগোর অন আর্ট এ্যাণ্ড এসথেটিকস্, ১৯৬১

কবি নিজের ছবি সম্বন্ধে বলেছেন—'ছবিতে নাম দেয়া একেবারে অসম্ভব। তার কারণ আমি কোনো বিষয় ভেবে আঁকি নি—দৈবক্রমে একটা কোনো অজ্ঞাত কুলশীল চেহারা চলতি কলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে, জনকরাজার লাঙলের ফলাব মুখে যেমন জানকীর উদ্ভব। একটিকে সহজে নাম দেয়া যায়, কিন্তু আমার যে অনেকগুলি—তারা অনাহূত এসে হাজির—রেজিস্টার দেখে নাম মিলিয়ে নেব কোন উপায়ে। জানি, রূপের সঙ্গে নাম জুড়ে না দিলে পরিচয় সম্বন্ধে আরাম বোধ হয় না। তাই আমার প্রস্তাব এই, যাঁরা ছবি দেখবেন বা নেবেন তাঁরা অনামীকে নিজেই নাম দান করুন।"

রবীন্দ্র চিত্রকলায় টানের বৈশিষ্ট্য অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু কয়েকটি নারী প্রতিকৃতিতে একই ধরনের চোখেব গড়ন, রেখাঙ্কনের টান ও ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করার মতন। রবীন্দ্রনাথের আঁকা বহু নারী চিত্রে তাঁর বৌদি কাদম্বরী দেবীর (দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী) ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর প্রভাব অনেক ছবিতে দেখা যাবে।

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, 'নতুন বৌঠানের (কাদম্বরী দেবী) চোখ দুটো এমনভাবে আমাব মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে গেছে যে, মানুষের ছবি আঁকতে বসলেই অনেক সময়ই তাঁর চোখ দুটো আমার চোখের সামনে জ্বল-জ্বল করতে থাকে। কিছুতেই ভুলতে পারি নে। তাই ছবিতেও বোধ হয় তাঁর চোখের আদল এসে যায়।'

কাদম্বরী দেবী রবীন্দ্র জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিলেন। অল্প বয়সে মাকে হারান রবীন্দ্রনাথ। পিতা দেবেন্দ্রনাথ সাধন-কর্ম নিয়ে

ব্যস্ত থাকতেন। পাহাড়ে-পর্বতে কাটত তাঁর দিন। ওই সময়ে এলেন তাঁদের বাড়িতে কাদম্বরী দেবী বৌ হয়ে। মাতৃহারা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী ছিলেন তাঁর নতুন বৌঠান। কিশোর রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাঠক ও সমালোচক তাঁর নতুন বৌঠান। পরবর্তীকালে বহু বই রবীন্দ্রনাথ তাঁর নতুন বৌঠানকে উৎসর্গ করেছেন। 'ছবি ও গান' বইয়ের উৎসর্গ পত্রে লেখেন. গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ বৎসবকার বসন্তে মালা গাঁথিলাম। যাহার নয়নকিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি একটি একটি করিয়া ফুটিত, তাঁহারি চরণে উৎসর্গ কবিলাম। 'শৈশব সংগীত' বইয়েব উৎসর্গ পত্রে লেখেন—'বহুকাল হইল তোমার কাছে বসিয়া লিখিতাম, তোমাকে শুনাইতাম। এই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ কবিতেছে। তাই মনে হইতেছে তুমি যেখানেই থাক না কেন, এ লেখাগুলি তোমাব চোখে পড়বেই।'

ববীন্দ্রনাথ অল্প বয়সে মাকে হারিয়ে নতুন বৌঠানের কাছ থেকে যে স্নেহ-মমতা পেয়েছিলেন তারও আয়ু বেশী দিন ছিল না। তাঁর নতুন বৌঠান মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। বৌঠানের অভাব বোধ থেকে যে দুঃখ তিনি পেয়েছেন তা তিনি ব্যক্ত কবতে চেয়েছেন বহু কবিতায় বহু চিত্রে। তাই রবীন্দ্র চিত্রকলায় খুঁজলে বহুভাবে দেখা যাবে কাদম্বরী দেবীব চোখ মুখের আদল। বিষাদমাখা চোখেব অভিব্যক্তি দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথেব আঁকা বহু নাবী চিত্রে।

রবীন্দ্র চিত্রকলাব বৈশিষ্ট্য এবং অঙ্কন শৈলীব ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে কবিব 'শেষ সপ্তক'-এর একটি কবিতা থেকে—

> "জগতে রূপের আনাগোনা চলছে।
> সেই সঙ্গে আমার ছবিও এক-একটি রূপ,
> অজানা থেকে বেরিয়ে আসছে জানার দ্বারে।
> সে প্রতিরূপ নয়।

মনের মধ্যে ভাঙ্গা গড়া কত কতই জোড়াতাড়া ;
কিছু বা তার ফুটে ওঠে চিত্রে,
এতদিন এইসব আকাশবিহারীদের ধরেছি কথার ফাঁদে।
আজকাল আছে সে চোখ মেলে।
রেখার বিশ্বে খোলা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে দেখবে ব'লে ;
সে তাকায়, আর বলে, 'দেখলেম'।"

———

লেখক যখন তুলি ধরেন

বিশ্বের বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক কলম চালনার ফাঁকে-ফাঁকে পাণ্ডুলিপির ওপব কলম দিয়ে বহু ছবি এঁকেছেন। তাঁদেব কেউ কেউ অবসর সময়ে রঙ তুলি নিয়ে বসেছেন। সাহিত্য সৃষ্টিব সঙ্গে তাঁরা চিত্রকলা সৃষ্টি করেছেন। বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যে এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কারুব নাম বড় একটা শোনা যায় না। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তাবাশঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বনফুল ছবি এঁকেছেন। সে খবব অনেকেই রাখেন। শোনা যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটদেব একটি লেখার পাণ্ডুলিপিতে কিছু স্কেচ্ এঁকেছেন।

লেখকবা কেন তুলি ধবেন সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক চিঠিতে শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখেছিলেন, 'বহুদিন আমাব নেশাব দুই মহল ছিল 'বাণী এবং গান'। শেষ বয়সে তাব সঙ্গে আব-একটা এসে যোগ দিয়েছে—ছবি। মাতালেব মাত্রা অনুসাবে বাণীব চেয়ে গানেব বেগ বেশী, গানের চেয়ে ছবির। যাই হোক এই লীলা সমুদ্রেই আবস্ত হয়েছে আমার জীবনেব আদি মহাযুগ।' —চিঠিপত্র, ১৪ জুন ১৯৩১

লেখক ববীন্দ্রনাথেব কলম দিযে ছবি আঁকা সম্বন্ধে তাঁব পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী বলেছেন—'বোধহয় ১৯২৭-এ তিনি তুলিব কাজ বা কলমের মুখ দিয়ে বেখাঙ্কন শুরু করেন। বহুকাল পরে পাণ্ডুলিপির খাতায় লেখা—কাটাকুটিব ছলে এই আঁকা-জোঁকাব কাজে মন দেন। এই রকম অনেকদিন ধরে লেখাব সঙ্গে আঁকাব সময় তাঁব মন ডানা ছড়িয়ে অবাধ কল্পনালোকে ঘুবতে পাবত। লেখাব মাঝে সময়টুকু তাঁর চিত্তকে চিন্তা করবার অবকাশ দিত। বস্তুতঃ এমনি কবেই তাঁর লেখা, কাটাকুটির খেলা একদিন চিত্রজগতের দ্বাবে এসে ঘা দিল।' —বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটি করে যে সব ছবি ফুটে উঠেছে তার কৈফিয়ৎ কবি দিয়েছেন তৎকালীন প্রবাসী পত্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—

'শ্রদ্ধাস্পদেষু, অগ্রাণের প্রবাসীর জন্য আমার কবিতার একটি কাটাকুটি চিত্রিত পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছি। তাব সঙ্গে যদিও পূর্ব প্রকাশিত কোনো কবিতার সম্পর্ক আছে তাবুও তাকে নতুন বলেই গণ্য করা উচিত।' —চিঠিপত্র ১৯ আশ্বিন, ১৩৪৩

রবীন্দ্রনাথের মতন বহু বিদেশী সাহিত্যিক তুলি ধরেছেন এবং স্কেচ্ এঁকেছেন। তাঁদের আঁকা অনেক ছবি দেখার মতন। মনে রাখার মতন বা বাঁধিয়ে রাখার মতন। রবীন্দ্রনাথেব মতন বহুমুখী প্রতিভাধর সাহিত্যিক দেখা যায় জার্মান সাহিত্যে কবিবব গ্যেটে আব ফরাসী সাহিত্যিক ভিক্তব হুগোব মধ্যে। জার্মান কবি গ্যেটে ছিলেন স্যাক্স রাজাদেব মন্ত্রী। ভূবিজ্ঞানে তাঁব দখল ছিল অসাধারণ। ভাইমারে গোটে মিউজিয়মে রক্ষিত গ্যেটের আঁকা ছবি আব ভূতাত্ত্বিক সংগ্রহ সবার কৌতূহল বাড়ায়।

ফরাসী সাহিত্যিক হুগো, সাহিত্যেব সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিয়েছিলেন। তাঁব আঁকা ছবিগুলো প্রথম শ্রেণীর।

জগতেব প্রায় সব দেশেব সেরা সাহিত্যিকরাই শিল্পী। সেই সব মনীষী সাহিত্যিকদেব সব রকমেব সৃষ্টিই শিল্প। তা হলেও সাধারণেরা বলবেন সেটা সাহিত্য-শিল্প। শিল্প—শিল্পই। সাহিত্যও শিল্প, আর্টও শিল্প। দু-এরই স্রষ্টা মনীষী। দুটোই আর্ট। একটা হল কাগজের বুকে কলম দিয়ে অক্ষরাকারে সৃষ্টি, অপরটা হল মোটা কাগজে বা ক্যানভাসে তুলির সৃষ্টি। দুটোই সৃষ্টি, দুটোই শিল্প।

বিশ্বের সব বিখ্যাত সাহিত্যিকরাই ছিলেন আর্টিস্ট, সাহিত্যিক তো বটেই। তার পরিচয় পাই তাঁদের আঁকা ছিন্নপত্রের ওপর ছোটখাট স্কেচ্ থেকে। তবে বেশীর ভাগ বিখ্যাত সাহিত্যিকদের অঙ্কিত চিত্রপটই থেকে গেছে অজ্ঞাত। তাঁরা বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক হলে

হবেন কি, কিন্তু তাঁদের আর্টিস্ট-প্রতিভা রয়ে গেছে অজ্ঞাত। টলস্টয় ও কবি গ্যেটের মতন শিল্পীর পরিচয় আমরা ক'জনে রাখি? এঁরা কোনো অংশে ছোট শিল্পী নন। এঁদের প্রতিভা বহুমুখী। তার পরিচয় শুধু সাহিত্যেই অনুসন্ধান করলে চলবে না। অঙ্কিত চিত্রগুলোরও অনুসন্ধান করতে হবে।

সব বিখ্যাত সাহিত্যিকরাই অবসর সময়ে চিন্তাস্রোতকে শুধু অক্ষরেই আবদ্ধ রাখেন না, সময়ে সময়ে তুলি কিংবা রঙিন পেন্সিল দিয়েও কাগজের বুকে এঁকে চলেন। আমাদের দেশে তার প্রধান উদাহরণ হলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিগুলো কি অপটুতার পরিচয় দেয়? মোটেই নয়। আধুনিক চিত্র-শিল্পের সংজ্ঞা অনুযায়ী সেগুলো অতি আধুনিক বা রিয়ালিস্ট। যে কোনো চিত্র-সমালোচক এ স্বীকার করতে বাধ্য। তিনি কোনো দিন আর্টস্কুলের ছাত্র ছিলেন না সত্য, কিন্তু তাঁর আর্টিস্ট মনই আঁকিয়েছেন অতি আধুনিক ছবিগুলো। এমনি ভাবেই এঁকেছেন বিশ্বের অন্যান্য বিখ্যাত সাহিত্যিকরা।

এদিক দিয়ে জার্মান কবিবর গেটে ছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই মতন। নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত আধুনিক দার্শনিক আলবেয়ার সোসাইৎসার বলেছেন যে, গ্যেটের মতন আর্টিস্টরাই রচনা করেছেন মহামূল্য কবিতা এবং সেই সব কবিদের আত্মাই হল আর্টিস্টদের আত্মা। তাঁরা কখনো এঁকেছেন, কখনো বা লিখেছেন। দুই-ই সাহিত্য, দুই-ই শিল্প; আর্টিস্ট, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ এই তিন মিলে যে আত্মার সৃষ্টি সে হল কবি।

বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকদের মধ্যে যারা ছিলেন আর্টিস্ট তাঁরা কিন্তু রয়ে গেছেন অজ্ঞাত। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, লিও টলস্টয়, ভিক্তর হুগো, গ্যেটে, গারসিয়া লোরকা, থ্যাকারে, লিউইস্ ক্যারল, এইচ. জি. ওয়েলস্, বদলেয়ার, ভ্যালেরি, মার্ক টয়েন, এডগার আলান পো, পুস্কিন, গোগোল, র‍্যাঁব, শার্লত ব্রন্ট, পিয়ের লোতি,

হারমান্ হেস্, জর্জ স্যাণ্ড, জ' ককতো, স্টিণ্ডবার্গ, স্টিভেন্‌শন, মায়াকাভেস্কি, দান্তে, হান্স ক্রিশ্চান এণ্ডারসন ও আরও অনেকে।

ফরাসী সাহিত্যিক মনীষী ভিক্তর হুগোর আঁকা ছবিগুলো রহস্যময়। তিনি যেমন স্কেচ্ এঁকেছেন তেমনি প্রচুর জলরঙও ব্যবহার করেছেন। কোনো কোনো সমালোচক তাঁর আঁকা ছবিগুলোকে রেমব্রাণ্ট্ বা গইয়ার সাথে তুলনা করেছেন।

ফরাসী সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ হলেন ভিক্তর হুগো। রবীন্দ্রনাথ যেমন শুধুই সাহিত্যিক ছিলেন না, ছিলেন ভাবতের নেতা, তেমনি বহুমুখী প্রতিভা ছিল ভিক্তর হুগোর। স্বদেশী নেতা রবীন্দ্রনাথের মতন ভিক্তর হুগোর লেখনী বলে ফ্রান্সে ঘটে বিপ্লব (যার নাম প্যারিস কম্যুন বা 'কম্যুন দ্য পারী') ১৮৪৮ সালে। ফরাসী বিপ্লবের পর আবার যখন রাজতন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠে তার বিরুদ্ধে লেখনী ধরেন ভিক্তর হুগো। ভিক্তর হুগোর 'নত্‌র দাম' উপন্যাস রচিত হয় রাজতন্ত্র ও গীর্জার অত্যাচারের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথের মতন অসংখ্য লিখেছেন ভিক্তর হুগো। তেমনি রবীন্দ্রনাথের মতন তিনি কাগজের বুকে কলম ও তুলির আঁচড়ে যা সৃষ্টি করেছেন তা দেখে একালের চিত্র-সমালোচকরা বলেছেন যে, ভিক্তর হুগোই একালের আধুনিক চিত্রকলার জনক।

প্যারিসের 'প্লাস দে ভোজ'-এর একটি বাড়ীতে ভিক্তর হুগো মিউজিয়ম। এখানে লেখক বাস করতেন। সেই মিউজিয়মে ভিক্তর হুগো অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শনী স্থায়ী। প্রায় ছ'শত ছবি এখানে স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে পঞ্চাশটি হল এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট। যা সেকালে ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট আঁকার কথা কেউ ভাবতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। ভিক্তর হুগোর আঁকা ছবিগুলো দেখলে মোহিত না হয়ে পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথের মতন তিনিও কবিতার পাতায়, পাণ্ডুলিপির ওপর বহু আঁচড় কেটেছেন, যার নাম আধুনিক আর্ট। তাছাড়া ছোটদের জন্যে তিনি এঁকেছেন অসংখ্য

আ. র.—২

ছবি। তাঁরই প্রতিবেশী নাবালক শিশুদের মন ভোলাতে যে সব ছবি তিনি এঁকেছেন সেগুলো দেখবার মতন। তারপর রয়েছে জলরঙা ছবিগুলো। স্কেচগুলো যেন হুবহু রবীন্দ্রনাথের আঁকা।

ইউরোপের বহু সাহিত্যিক অবসর বিনোদনে আর্ট চর্চা করতেন। এখনও অনেকে করছেন। ওটা ওঁদের বিলাস নয়, ওঁদের শিল্পী মনের প্রকাশ। সেই শিল্প প্রকাশ আমরা দেখতে পাই একালের জার্মান সাহিত্যিক টমাস মান্, ফরাসী কবি গিয়োম অ্যাপোলিনেয়ার, আর জঁককতো তো রীতিমতন আর্টিস্ট।

লুইস ক্যারল এঁকেছেন তাঁরই 'এলিস ইন দি ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড'-এর চিত্রগুলো অতি নিপুণ ও নিখুঁত চাতুর্যে। হান্স ক্রিশ্চান্ এণ্ডারসন তুলি বা পেন্সিল দিয়ে আঁকতেন না, তিনি কাঁচি দিয়ে কাগজ কেটে জোড়া দিয়ে দিয়ে নতুন ছবির সৃষ্টি করতেন। সেগুলো অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ফরাসী কবি বদ্লেয়ার-এর আঁকা ছবি সম্বন্ধে বিখ্যাত ফরাসী চিত্রশিল্পী দিলাক্রোয়া মন্তব্য করেছিলেন যে, বদ্লেয়ার কবি হলে হবে কি, ঠিক যেন নিপুণ চিত্রশিল্পী।

এইচ্. জি. ওয়েলস, ডি. এইচ্. লরেন্স ও থ্যাকারে সাধারণ আর্টিস্ট ছিলেন না। এঁদের আঁকা ছবিগুলোকে যে কোন উঁচুদরের বা পেশাদার চিত্রশিল্পীর আঁকা চিত্রের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। থ্যাকারের আঁকা ছবিগুলো একটু শ্লেষাত্মক।

টলস্টয় কিন্তু আঁকতেন তাঁর সন্তানদের জন্যে। তিনি জুল্ ভার্নের লেখা 'আশী দিনে বিশ্বপ্রদক্ষিণ' পড়ে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, শীতকালের রাত্রিতে নিজে উচ্চৈঃস্বরে সে বই পড়তেন আর শোনাতেন তাঁর ছেলেমেয়েদের। আর মাঝে মাঝে ছবি এঁকে দেখাতেন ও বোঝাতেন তার সন্তানদের। সেই সব আঁকা ছবিগুলো সত্যি সত্যিই পাকা আর্টিস্টের আঁকা ছবি বলে মনে হবে।

কবিবর গ্যেটে বলেছিলেন যে, আমাদের উচিত হবে কম কথা বলা, আঁকতে হবে অনেক।

আধুনিক কালের সাহিত্যিকদের মধ্যে হারমান্ হেসে ও জঁককতো বেশ নাম করেছেন চিত্রাঙ্কনে। ফরাসী সাহিত্যিক জঁককতো তো দক্ষিণ-ফ্রান্সের এক গ্রামের ছোট একটা গীর্জার অভ্যন্তরে সমস্ত দেওয়াল-চিত্র তিনি একাই এঁকেছেন সুনিপুণ হস্তে। জঁককতোব আঁকা ছবি নিয়ে তাঁর মৃত্যুর পব ফরাসী সরকাব একটি বিশেষ ডাক টিকিট বের করেছিলেন।

সাহিত্যিকরা যেমন ছবি এঁকেছেন তেমনি বহু আর্টিস্ট লিখেছেন প্রচুর। বিদেশের বেশ কিছু আর্টিস্ট অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। লিওনার্দো দাভিঞ্চির মতন প্রতিভাধব শিল্পী শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না তিনি আবার ইঞ্জিনিয়াব এবং গণিতজ্ঞ ছিলেন। বাঙালী শিল্পীদের মধ্যে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর সাহিত্য সর্বজন বিদিত। তবে এঁদের সংখ্যা অনেক কম।

ক্যালিগ্রাফির উৎকর্ষ কবির হস্তাক্ষরে

তুলির বদলে কলমের মুখ দিয়ে কবি শুধু ছবি আঁকেন নি। কলমের মুখে লেখা লেখি সে আবেক আর্ট। কবি সারা জীবনে কত হাজার পৃষ্ঠা লিখেছেন তার হিসেব করে গবেষণার অবকাশ রয়েছে। হাতের লেখাটা যেমন তেমন হলে, কোনো প্রশ্ন, কোন কৌতূহল কারুর মনে জাগত না। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক যুগে অন্যদের মতন গতানুগতিক ধাঁচে হাতের লেখা লিখতেন না তিনি। রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর তাঁর একান্ত নিজস্ব। রবীন্দ্র সঙ্গীত, নৃত্য বা চিত্রকলার মতনই তার হাতের লেখার স্টাইল এক নতুন সৃষ্টি : এক কথায় অনন্য। রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে আরম্ভ করে একালের তরুণরা পর্যন্ত রবীন্দ্র হস্তাক্ষর নকল করার প্রচেষ্টা করে চলেছে। অনেকে সফলও হয়েছেন। রবীন্দ্র হস্তাক্ষরের মধ্যে আর্ট যেন ফুটে উঠেছে তেমনি বাংলা লিপিতে এ এক নতুন সংযোজন। চিরাচরিত প্রথায় হাতের লেখা না লিখেও কেমন সুন্দর ভাবে বাংলা লিপি লেখা যায় তাও দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

ক্যালিগ্রাফি নিয়ে সব দেশেই আন্দোলন হয়েছে। সব দেশের শিল্পীরাই চান তাঁদের লিপির আদর আরও সুন্দর হোক। দেখতে সুন্দর হলে সব সময়ে পড়তে সহজ হয় না। রবীন্দ্র হস্তলিপির বৈশিষ্ট্য এখানেই। রবীন্দ্র হস্তলিপি দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি পড়তেও সহজ। দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত ছাপার অক্ষরে অর্থাৎ ছাপাখানার টাইপে রবীন্দ্র হস্তলিপি চালু হল না।

আমার মনে হয়, এদেশে ক্যালিগ্রাফি আন্দোলনের অগ্রদূতও রবীন্দ্রনাথ। তিনি শুধু নিজের হাতের লেখাতে সৌন্দর্যের বিকাশ এনেছেন তা নয় বাংলা লিপিতে সৌন্দর্যও আনতে চেষ্টা করেছিলেন।

হস্তাক্ষর সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শ্রীদিলীপকুমার রায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

"......হস্তাক্ষরের উৎকর্ষ ইন্দ্রিয় তোষণে নয়। তা যদি হ'ত তাহ'লে ছাপার অক্ষরের আদর্শকে হস্তাক্ষরের আদর্শ বলতেম। কিন্তু ছাপার অক্ষরে রেখা আছে আত্মা নেই। হাতের অক্ষরে সৌন্দর্য যদি থাকে তো সেটা উপরি পাওনা—তার সত্যকার রস হচ্ছে তার ব্যক্তি-বিশেষত্ব। সুন্দর ছবি বলতে যে রম্ভা-তিলোত্তমার ছবি বুঝতে হবে তা নয়—সে রকম করে বোঝাটা ছেলেমানুষি—ছবির বিষয়টা নয়নলোভন একেবারেই না হতে পারে, কিন্তু সে আমাদের মনকে টানে তার ব্যক্তি-স্বরূপগত সত্যে। এই আত্মিক সত্যই পাই গানে—আর অনাত্মিক সৌন্দর্য থাকে রাগিণীর প্রদর্শনীতে—কলাবস্তুতে এই আত্মিক সত্য আঙ্গিক সৌন্দর্যের চেয়ে অনেক বড়ো। হাতের অক্ষরে আমরা সেই আত্মিক অর্থাৎ Personal সত্যকে চাই, ছাপার অক্ষরের অনিন্দ্যনীয়তা চাইনে। তোমার হাতের অক্ষরে তোমাকে পাওয়া যায় এই হচ্ছে ওর দাম। এ ছাড়াও ওর আর একটা প্রয়োজন আছে, যে কথাগুলো লিখ্‌ছ সেগুলোর পরিচয় যেন গুলিয়ে না দেয়। ক-বর্গের সঙ্গে প-বর্গের পার্থক্যটা বজায় রাখলে পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হওয়া যায়—সেটা কম পুণ্য নয়। তোমার অক্ষর যে দুর্বোধ্য তা কেউ বলবে না—অপরপক্ষে তোমার অক্ষরকে নয়নলোভন যদি বলি তাহলে বুঝতে হবে তোমার কাছে আমার টাকা ধার করবার গরজ আছে—কিংবা কন্যাদায়।"

ছাপাখানার বাংলা লিপির সংস্কার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোন কার্যক্রম ছিল কিনা তা এখনও জানা যায় নি। তবে বাংলা হাতের লেখায় তিনি পরিবর্তন চেয়েছিলেন সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। তার প্রমাণ তাঁর নিজস্ব হাতের লেখার স্টাইলে। এ সম্বন্ধে একালের এক বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শ্রীপরিতোষ সেন যথেষ্ট গবেষণা করেছেন।

শ্রীপরিতোষ সেন শিল্পী বলেই রবীন্দ্র হস্তলিপির আর্টকে হৃদয়ঙ্গম

করতে পেরেছেন। রবীন্দ্র হস্তাক্ষর সম্বন্ধে পরিতোষ সেন বলেছেন, "ইংরেজীতে calligraphy বলে একটা কথা আছে। এটা চিত্রশিল্পের ব্যাপারে যতটা খাটে হাতের লেখার (কলম এবং তুলির) ব্যাপারে ততোধিক।

আমার বিচারে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে এরকমই একটা সুষম সম্পূর্ণতা আছে যা শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মে থাকে, তা ছবিই হোক, ভাস্কর্য স্থাপত্য অথবা কারুকর্মই হোক। বিশেষ করে তাঁর পঞ্চাশোত্তর লেখার মধ্যে। এখানে আরেকটি কথাও বলে রাখি। সেটি হল এই যে, ছোট ছোট অক্ষবে ছাপা বই কিংবা সংবাদপত্রাদি পড়ি তখন আমাদের কোনো ধারণাই হয় না যে, একটি ছাপার অক্ষরের মূল আয়তনে—অর্থাৎ এগার সেন্টিমিটারে তাব কী চেহারা হতে পারে। এই বৃহদাকারের অক্ষবগুলো যে সাদাকালোয় আঁকা এক একটি নিখুঁত ছবি কিংবা ভাস্কর্যের মতই দেখায় তা আমাদের খেয়ালই হয় না। ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের লেখা "ধ" অক্ষরটি। যেন একটি বক এক পায়ে দাঁড়িয়ে তার মাথাটি বুকেব নরম পালকের মধ্যে গুঁজে ঘুমোচ্ছে। শুধু ঠ্যাঙ্‌টি জুড়ে দিলেই হল। কিংবা "দ" অক্ষরটি যেন মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে একটি লোক দাওয়ায় বসে আছে। একটু নজর দিয়ে দেখলে এবং তাব সঙ্গে সামান্য একটু কল্পনা মেশালেই, গাছপালা, মানুষজন, পশুপাখি অনেক কিছুই দেখা যাবে। ছবির জগতের মতই টাইপের জগতও আশ্চর্য বৈচিত্র্যময়।

রবীন্দ্রলিপির আব একটি দিক হল তার স্ট্রাক্‌চার কিংবা তার গঠনমূলক সৌন্দর্য; অর্থাৎ সমান্তরাল, উর্ধ্বরেখা এবং কোণাকুণি রেখার এমনই ঋজু বন্ধন, এমনই তার ঋজু কাঠামো যে একটি বড় গাছ কিংবা একটি দালানবাড়ির মতই সটান দাঁড়িয়ে থাকবার ক্ষমতা থাকবে। তাছাড়া আছে তার সহজপাঠ্যতা। অর্থাৎ লেখার প্রত্যেকটি অক্ষর অনায়াসে চিনতে পারা। বর্ণমালার সঙ্গে নতুন পরিচয় হয়েছে এমন শিশুর পক্ষেও একথাটির গুরুত্ব আছে, কারণ অনেকের হাতের

লেখা সহজপাঠ্য হলেও প্রতিটি অক্ষরের এমন সুস্পষ্টতা থাকে না। আর একটি বৈশিষ্ট্য হল তাঁর অক্ষরের বিস্তার। অর্থাৎ চাপা, সরু কিংবা অতিঘন লেখা নয়। গোটা গোটা বেশ গোল গোল লেখা। অতিশয় চাপা বা ঘন অক্ষরের তুলনায় গোলাকৃতি, মানে যে অক্ষরের ভেতর এবং বাইরে বেশ ফাঁকা জায়গা রয়েছে এমন অক্ষরের শব্দ এবং বাক্য। অতি সহজ-পাঠ্য এবং দীর্ঘ পাঠ্যবস্তু পড়ার পক্ষে এর উপযোগিতা আমাদের অজানা নয়। এই গোলাকৃতির দরুণ তাঁর হস্তলিপিতে সরলরেখা এবং কৌণিক আকার তুলনামূলকভাবে কম অর্থাৎ বক্ররেখার প্রাধান্য। ফলে এই হস্তলিপি যেন অর্ধনারীশ্বরের রূপ নিয়েছে। একদিকে যেমন রমণীর কমনীয়-সৌন্দর্য আর লাবণ্য, অন্যদিকে, স্বল্প হলেও, সরলরেখা এবং কৌণিক আকারের এমনই জোবালো ব্যবহার যে গোটা চেহারায় বেশ একটা পৌরুষেব ছাপ।

উঁচুদবেব ক্যালিগ্রাফির একটা বিশেষ দিক হল তার বাহাবী কাজ কিংবা টান্-টুন্। এই টান্-টুনগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় তাঁর হ্রস্ব-দীর্ঘ ইকার-উকারে, রেফ, রফলা-যফলায় এবং কোনো কোনো অক্ষরের এবং বাক্যের শেষে। এই টান্-টুনগুলো এত বাহারের যে তা সত্যিই চোখ দিয়ে ভোগ করাব বস্তু। অনেকে এসব বেশ মক্শ করে আয়ত্ত করেন, বিশেষ করে দস্তখতের বেলায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ছিল এটা পুরোপুরি স্বতঃস্ফূর্ত।

একটু আগেই তাঁর হস্তাক্ষরে বক্ররেখার প্রাধান্যের কথা বলছিলাম। এটা এসেছে ছন্দের খাতিরে। এই ছন্দই তাঁর লেখাব সর্বপ্রধান উপকরণ, সর্বপ্রথম আকর্ষণীয় বস্তু। এই ছন্দ বহমান নদীর ঢেউ-এর মত বারবার উঠছে আর পড়ছে। কিন্তু নদীর দু'টো ঢেউ যেমন একরকম হয় না তেমনি এ লেখার ছন্দেতেও কোথায়ও একঘেয়েমি নেই।

কবিতার ছন্দরাজার হস্তাক্ষরে ছন্দের প্রাধান্য থাকবে এতে আর আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই লেখার ছন্দতো লিরিক বা গীতি-

কবিতার ছন্দেরই একটা সম্প্রসারণ। আমরা এও জানি যে তাঁর লেখার কাটাকুটিতে ছন্দ আনতে গিয়েই তাঁর ছবি আঁকার জন্ম হয়। অল্প কয়েকটি কৌণিক কিংবা শুধু সরলরেখার ছবি বাদ দিলেই তার বেশীর ভাগ ছবিতে এই ছন্দই হল তার মূল উপকরণ এবং এ ছন্দ যে সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়গত তার প্রচুর আভাস আছে তাঁর ছবিতে, বিশেষ করে শেষের দিকের ছবি।"

—কবির হস্তাক্ষর থেকে ছাপার অক্ষর'—পরিতোষ সেন। আনন্দবাজার পত্রিকা,

বিদেশে রবীন্দ্র চিত্রকলা

বহু রবীন্দ্রানুরাগী, বিশেষজ্ঞ ও সমালোচক অনেকবার এবং অনেক জায়গায় বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ নেহাৎ সময় কাটাবার জন্যে আঁকতেন। এবং সে-সব আঁকা-ঝোকা নাকি তাঁর পাঞ্চাশ বছর পেরুবার পরে। সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে বহু ববীন্দ্রানুরাগী আর্টিস্ট হিসেবে বহু উঁচুতে স্থান দিতে চান নি। সম্ভবতঃ দুটো কাবণেঃ প্রথম, আর্ট সম্বন্ধে তাঁদের ধাবণা বোধ হয় প্রথম স্তবেব অথবা তাঁরা আর্ট সম্পর্কে একেবারে নির্বিকাব। দ্বিতীয়, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে তাঁবা রবীন্দ্রনাথের আর্টকে শেষ বয়সে বিলাসিতা বলে মনে কবেন।

প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথকে বহু রবীন্দ্রানুবাগী, বিশেষজ্ঞ ও সমালোচকরা কবি ববীন্দ্রনাথ, সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ হিসেবে যতটা সম্মান দেখান ততটা দেখান না শিক্ষক, স্বদেশী যুগেব নেতা, বাঙলা ভাষা প্রচাবক অথবা কর্মী হিসেবে। বিশ্বভারতী থেকে আরম্ভ করে শ্রীনিকেতনে শিল্পসংস্থা ও সমবায় আন্দোলন কবি মনেব পরিচয় নয়। সেখানে কোমল কান্ত ববীন্দ্রনাথ নন। রবীন্দ্রনাথ সেখানে কর্মঠ ও শিল্পসংস্থার অধিনায়ক। কোনো দেশের কোনো মহাকবিকে এই পর্যায়ে কোনো কালে দেখা যায় নি। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেশ-বিদেশে মহাকবিদের সঙ্গে পার্থক্য। এই সব কারণেই রবীন্দ্রনাথ অনন্য।

শুধু সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবেই রবীন্দ্রনাথ অগ্রদূত নন। তিনি নৃত্যনাট্য, নাট্যকার ও মঞ্চ পরিকল্পনারও অগ্রদূত। সেই হিসেবে এদেশে মডার্ন আর্টের অগ্রদূত রবীন্দ্রনাথ। যে যুগে রবীন্দ্রনাথ আর্ট চর্চা শুরু করেন অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় তখন এদেশে চিবায়ত ভারতীয় আর্ট ছাড়া পশ্চিমের নতুন অধ্যায়ের কথা কেউ ভাবতে শেখেন নি। রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে ইউরোপের যোগাযোগ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে।

তখন মডার্ন আর্ট নিয়ে ইউরোপে প্রবল আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। গ্রীস-রোমের চিরায়ত আর্টের যুগ শেষ হয়েছে সেখানে। আমরা কিন্তু চিরায়ত ভারতীয় আর্ট নিয়েও পড়েছিলাম। আর্ট সম্বন্ধে নতুন কিছু বলা তখন সহজ ছিল না এদেশে। তাহলেই তিনি হতেন অপাংক্তেয়। রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম। তাই তিনি যুগের সঙ্গে তাল রেখে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় যে ইউরোপীয় আর্টে নবচেতনার শুরু হয় সেই পথেই চলতে শুরু করেন এবং এই কারণেই রবীন্দ্র চিত্রকলা আমাদের দেশে চিত্রসমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। এই বিরোধ চলে বহু কাল, প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ধরে। কেন জানি না, বহু রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ ও অনুরাগীরা রবীন্দ্রনাথকে চিত্রশিল্পী হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পী হিসেবে তাঁর সমকালীন অন্যান্য ভারতীয় চিত্র-শিল্পীদের তুলনায় কোনো অংশে খাটো ছিলেন না বরং ছিলেন শ্রেষ্ঠ। এই সত্য কথাটি সেকালে বহু পণ্ডিত মানতে চান নি।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, রবীন্দ্র চিত্রকলা বিদেশী সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ তো করেছিলই, এমন কি একালের কিছু নামকরা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্র-সমালোচক আমায় বলেছেন, রবীন্দ্র-চিত্রকলা প্রথম শ্রেণীর।

প্যারিসকে আর্ট জগতের রাজধানী বলা হয়ে থাকে। রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীতে অর্থাৎ ১৯৬১ সালে প্যারিসের বিবলিওথেক্ নাশিতনাল রবীন্দ্র-প্রদর্শনীতে রবীন্দ্র-চিত্রকলার যৎসামান্যই প্রদর্শিত হয়েছিল। তাই দেখে বহু কলাসমালোচক লিখিছিলেন, 'এতো আধুনিক আর্ট'! প্যারিসে বাস করার সময়ে বহু কলাসমালোচকের মতামত চেয়েছিলাম রবীন্দ্র-চিত্রকলা সম্বন্ধে। তাঁদের মতে, এ হচ্ছে অতি আধুনিক সুররিয়ালইজম আর্ট। ইউরোপের বহু কবি-সাহিত্যিক অবসর সময়ে ছবি আঁকতেন। সে সব চিত্রের সংখ্যা খুব বেশী নয়। ইউরোপীয় কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম চিত্রশিল্পী ছিলেন জার্মান কবি গ্যেটে,

ফরাসী সাহিত্যিক ভিক্তর হুগো, বদলেয়র মলোর্মে, আপোলিনয়ার ইত্যাদি। এঁরা কেউ রবীন্দ্রনাথের মতন আড়াই হাজার ছবি আঁকেন নি। এঁদের অধিকাংশই পঞ্চাশ-একশর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকা শুরু করেন চৌদ্দ বছর বয়সে। নিয়মিত চিত্র-শিক্ষকের কাছে এবং আর্ট চর্চা শুরু করেন উনবিংশ শতাব্দীতে। তাও আবার বিলেতে বিদেশী আর্ট নিয়ে এবং সেই যোগাযোগ তিনি রক্ষা করে চলেন শেষ জীবন পর্যন্ত।

শিল্পী ও চিন্তাশীলদের মনন শক্তি অতি সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম বোধ আছে বলেই এঁরা অন্যায় সমালোচনা হলে অভিমানে আহত হন। মনেব কথা সবাইকে বলতে দ্বিধা বোধ কবেন। কিন্তু মনের ব্যাথা বোঝেন এমন শিল্পী-সাহিত্যিক পেলে মনেব ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এদেশে রবীন্দ্র চিত্রকলা নিয়ে রবীন্দ্রনাথেব জীবদ্দশায় বহু সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু বিদেশীবা রবীন্দ্র চিত্রকলা সাদরে গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্র চিত্রকলা, বিদেশে কেন সমাদর লাভ করল সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরেক চিন্তাশীল এবং সঙ্গীত শিল্পী দিলীপকুমার রায়কে কয়েকটা চিঠিতে লিখেছিলেন। শেষের চিঠিতে আছে বিদেশে কেন সমাদর লাভ করল রবীন্দ্র চিত্রকলা। দিলীপকুমার রায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"···একটু খোলসা করে বলি। আজকাল প্রায় মাঝে মাঝে ছবি আঁকার তাগিদ আসে। তখন দরজা বন্ধ করতে হয়। কলমের মুখে রূপের আবির্ভাব হয় নির্জনে। এই যে দ্বারের বাইরের লোককে ঠেকিয়ে রাখি এজন্যে নিজেকে দোষ দিই নে। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা তাঁর ছবির প্রথম আচড় টানেন গোপনে।

ছবি আঁকা ব্যাপারটা যদিচ নির্জনে তবু ছবি ব্যাপারটা সর্বজনের। এ স্থলে জনতারই কর্তব্য নিষ্কৃতি দেওয়া, রচনাশালায় আড্ডা জমাতে আসা ধৃষ্টতা। যারা ছবি আঁকাটাকেই মনে করে বাজে কাজ তারা বর্বর—তারা যা বলে বলুকগে, রাগ করে তো করুক। তারা কমিটি

মিটিং-এর কোরাম রক্ষার জন্য চেঁচামেচি করে—তখন দরজায় ডবল তালা লাগিয়ে কাজ বন্ধ করলে দোষ হয় না।"—১৮।৪।১৯৩১

"পাগল হয়েছ? আমাকে তুমি রীতিমত তুলিচালন চতুর আর্টিস্ট পেয়েছ নাকি? আমি ছবি আঁকি দৈববশে এতে আমার পুরুষাকার কিছুই নেই। তাই আমার সেই আজগুবি ছবি আঁকিয়েকে কোনো চলতি কাজের কোনো ব্যবহারেই লাগাবার উপায় নেই। ঐ হা-ঘরেটাকে আমার স্বদেশের লোকসমাজে প্রচার করতেও আমি অনিচ্ছুক—কেননা ওকে ওর জাত-কুলশীল জিজ্ঞাসা করলে প্রশ্নটাকে হেসে উড়িয়ে দেবে। তাছাড়া আমার মনটা আজকাল কুঁড়েমির গভীর সমুদ্রে ডুব সাঁতার কাটছে। বইরে থেকে আমার কোনো দরবার ওখানে পৌঁচচ্চে না। আমার এই চিঠির বহর দেখেই বুঝতে পাববে আমার কুঁড়েমির আয়তনটা।"—২ জুন ১৯৩১

"...অবশেষে শেষ বয়সে আমাকে দিয়ে ছবি-ছত্র খোলাবার নিষ্ঠুর সংকল্প করেছ। তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হবেনা কেন সে কথা বুঝিয়ে বলি। একদা শান্তনু মহারাজ গঙ্গাকে প্রেয়সী রূপে পাবার কল্পনা করেছিলেন, অনেক সাধ্য-সাধনার পর গঙ্গা রাজি হলেন এই কড়ারে যে তিনি আপনার ইচ্ছামত যা-খুশি তাই করবেন, এতে নরপতি কোনো কথাটি কইতে পারবেন না। চিত্রকলাকে আমি অনেক দিন মনে মনে প্রার্থনা করছি, যদি বা আমার শেষ দশায় তিনি ধরা দিলেন, তিনি চলেন সম্পুর্ণ নিজের খেয়ালে আমার মতলব অনুসারে কিছুই হয় না। আমার লেখনীতে যখন ভর করেন তিনি, তখন বোঝাবার জো থাকে না যে ঐ বাহনটি আমারই চিরদিনের বিশ্বস্ত অনুচর, আমারই অঙ্গুলির ইঙ্গিত বশগত। এমন অবস্থায় এ মহল থেকে প্রচ্ছদপটের আশা করো না।

আর একটি কথা আছে। পূর্বদিগন্তে রবির প্রথম উদয় প্রভাত সঙ্গীত মুখরিত—পূর্ব আকাশের জন্য বাণী রইল গান রইল। পশ্চিম আকাশে অস্তগমন বেলায় বর্ণ বিচিত্র ছবি। এই ভাষা পশ্চিম ভালো

বোঝে, পশ্চিমকেই উৎসর্গ করলুম। পূর্বসীমানায় সে থাকবে অবগুণ্ঠিত আমার এই বিধান। আমার ছবি ও গান সমুদ্রের দুই তীরে দুই নীড়ে ভিন্ন বাসায় থাকবে।......"—১৭ই জুন ১৯৩১

ইউরোপের মডার্ন আর্ট রবীন্দ্রনাথ বুঝতেন। ইউরোপীয় আর্টের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কি ঝড় বয়ে গেছে ওইসব দেশে। ইউরোপের আধুনিক আর্ট আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চাক্ষুষ পরিচয় ছিল। তাই তাঁর চিত্রকলায় ইউরোপের আধুনিক আর্টের প্রভাব এসে লাগে। কেমন ভাবে এলো তার পটভূমিকা বিশ্লেষণ করছি।

গত একশ বছরের ইউরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ইউরোপীয় চিত্রকলায় যখনই নতুন কোনো আন্দোলন হয়েছে তখনই সেই সেই দেশের সাহিত্যিকরা সেই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। সাহিত্যিকরা আর্ট জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন নি বরং অংশ গ্রহণ করেছেন। আমাদের দেশে তার ব্যতিক্রম দেখা গেছে। সাহিত্যিকরা সাধারণতঃ আর্টের জগৎ থেকে দূরে থাকতেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মতো অন্য কোন ভারতীয় সাহিত্যিক তাঁর সময়ে অত ঘন ঘন ইউরোপ যান নি। এবং ইউরোপীয় আর্ট জগতের সঙ্গে যোগাযোগও তাঁদের ছিল না। যা সম্ভব ছিল রবীন্দ্রনাথের।

রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপ গেছেন দুবার ১৮৭৮-৮০ আর ১৮৯০-তে। সেটা ছিল আর্ট জগতে নবযুগের সূচনা। তখন সেখানে নেওইম্প্রেশানিস্ট আন্দোলনের গৌরবময় যুগ। সেজান্, গগ্যাঁ, ভ্যান গগ, বনার্ ইত্যাদি তখন প্যারিস মাতিয়ে রেখেছেন। তারপর হল প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু আগে 'মোমার্ত'-এর যুগ। ইউরোপের শিল্পীরা প্যারিস জাঁকিয়ে বসেছেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মরিশ উত্রিল্লো, ভুইয়ার, রদাঁ, মাইওল, ভালাদঁ, রুয়ো। তৃতীয়বার কবির ইউরোপ সফর ঠিক এই সময়ে ১৯১২-১৩ সালে।

যখন ফোবইজম-এর জয়-জয়কার তখন কবি আবার ইউরোপ-আমেরিকায় ১৯১৬ সালে।

পাশ্চাত্ত্য আর্ট ও সাহিত্যে মোড় ঘুরিয়ে দেয় ডাডাইজম্ ও স্যুররিয়ালইজম। এর বিকাশকাল হল ১৯১৬ থেকে ১৯৪০। আর্ট ও সাহিত্যে এই নতুন মতবাদের অধিনায়ক ছিলেন ফরাসী শিল্পী ও সাহিত্যিক আঁদ্রে ব্রতঁ। ফরাসী, জার্মান, বেলজিয়ান, ডাচ, ইতালিয়ান ও স্প্যানিশ শিল্পী-সাহিত্যিকদের এক বিরাট অংশ এই আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ভজারা, আর্প, রিশটার, কাণ্ডিনিস্কি, পল ক্লি, ইয়াঙ্কো, ব্রাক্, লেজে, পিকারিয়া, জুয়ান মিরো, মাক্স আর্নস্ট, ঈভ টাঙ্গি, মাতিশ্, চিরিকো, শালভাডর ডালি, পিকাশো ইত্যাদি। আর সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন ফরাসী কবির দল—পিয়ের রভ্যার্দি, গিয়োম আপেলিনিয়ার, মাক্স জাকোব, ব্রতঁ, লুই আরার্গ, স্যুপোল, পল এলুয়ার, দেসনো এবং আরও অনেকে। —"পানোরামা দেজ্ আর্ প্লাসটিক কন্তমপর্যা"—জঁ কাশু! প্যারিস, ১৯৬০, পৃঃ ৫৫০—৫৮৭

ইউরোপে যখন আর্ট ও সাহিত্য জগতে স্যুররিয়ালিজম্ আন্দোলন জমে উঠেছে তখন রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ সালে ছিলেন জাপান ও আমেরিকায়। তারপর আবার এলেন ইউরোপে ১৯২০-২১, ১৯২৪, ১৯২৬, ১৯২৯, ১৯৩০-৩১। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ আর্ট নিয়ে কিছু লিখেছিলেন। তার একটি আমরা পাই ১৯২৬ সালে। ইতালিতে বসে লিখলেন 'দি মিনিং অব আর্ট' ১৯২৬ সালে। ১৯২০ থেকে ১৯৩১ এই এগার বছর কবি ইউরোপ-আমেরিকায় যাতায়াত করছেন নিয়মিতভাবে। মাঝখানে উনি দেশে এসেছেন। আবার ফিরে গেছেন ইউরোপ-আমেরিকায়। ঠিক এই সময়েই তিনি নিয়মিতভাবে ছবি এঁকেছেন ছবি আঁকার তাগিদে। কাগজে তিনি যা আঁকিবুঁকি করেছেন সেগুলোতে স্যুররিয়ালিজমের ছাপ দেখা যায়। তৎকালীন ইউরোপ-আমেরিকার শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ

যোগাযোগ ছিল বলেই তিনি সুররিয়ালিজমের প্রভাব এড়াতে পারেন নি। এবং তাঁর ওই সময়কার চিত্রকলার যে সব প্রদর্শনী হয়েছিল ইউরোপ-আমেরিকায় তার তারিফ করেছিল সেখানকার শিল্পী-সাহিত্যিকরা। দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকরা রবীন্দ্র চিত্রকলাকে আন্তরিকতা বা আদরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন নি।

অনেকে প্রশ্ন করেছেন বিংশ শতাব্দীব প্রথম তিন দশকে ইউরোপে যে আর্ট আন্দোলন হয় তার মধ্যে কোন্‌টির প্রভাব রবীন্দ্র চিত্রকলায় সবচেয়ে বেশী। রবীন্দ্র চিত্রকলা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে জার্মানীর এক্সপেশালিস্ট দলের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। ১৯১০ থেকে ১৯৩০ এই বিশ বছর জার্মান আর্ট ইতিহাসে এক নব যুগের অধ্যায়।

আর্টকে আমরা ললিত কলা বলি। আর্ট মানেই সুন্দর ছবি হতে হবে তেমন কোন মানে নেই। নেই কোন নিয়ম। আমাদের পরিচিত জগতে বহু অ-সুন্দরের হাট বসে। তাকে কি আমরা অবজ্ঞা বা তার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারি? জনগণ বলতে যা বোঝায় সেই তাদের সবাব মুখ ললিত কলার নিয়মে গঠিত নয়। সুন্দব যেমন আছেন তেমনি অ-সুন্দরও। বাস্তব চিত্রকে চিত্রায়ন করার আরেক নাম এক্সপ্রেশানইজম।

বিংশ শতাব্দীর দুই এবং তিন দশকে অধিকাংশ জার্মান চিত্রশিল্পী এই এক্সপ্রেশানইজম্ নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কির্কনাব, এরিখ হেকেল, স্মিট্-রটলুফ্ ওটো-মুল্যর, এমিল নোল্ড, পতলা মডাবশন-বেকের, অস্কার কোকোশকা, ফ্রাঞ্জ মার্ক, মাক্ ভাশিলি কাণ্ডিনিস্কি এবং পল ক্লি।

এঁদের আঁকা অধিকাংশ ছবিই গ্রাফিক আর্টট। কিছু স্কেচ্ ও আছে। এঁদের অধিকাংশ ছবিই বিষাদে ভরা। অ-সুন্দরেব ছড়াছড়ি বেশী। এই ধরনের আর্টের প্রভাব দেখা যাবে ববীন্দ্র চিত্রকলায়। কিন্তু কেন? রবীন্দ্রনাথের আশে-পাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই সেউন্নর্নের প্রতীক নন। আর হবেই বা কেমন করে। দেশের অধিকাংশ

মানুষ যেমন। যেমন তাঁদের চেহারা তেমনি তো হবে তাদের ছবি। সেই ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের আঁকা বহু ছবিতে দেখা যাবে নর-নারীর মুখে বিষাদের ছায়া। কোনো কোনো ছবি যেন জীবন্ত ভূত। তাই বলে কি আর্ট নয়? নিশ্চই এবং সেটা হচ্ছে এক্সপ্রেশানইজম্। রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া' বইয়ের ছবিতে তার পরিচয় মিলবে।

১৯৩০ সালে যখন প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার প্রদর্শনী হয় তখন নোবেল প্রাইজ পাওয়া ফরাসী সাহিত্যিক রোম্যাঁ রোলাঁ এবং মহিলা সাহিত্যিক কাউন্টেস্ আন্না গু নোয়াই বলেছিলেন এক কথায় 'অপূর্ব'। এর ক'মাস পরে মস্কোতে হয় রবীন্দ্র-চিত্রকলার প্রদর্শনী। সেখান থেকে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে এক চিঠিতে (২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০) রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। এখানে আমার ছবির আদর অন্য জায়গার চেয়ে বেশি বই কম হয় নি। এদের গ্যালারির জন্যে চারখানা ছবি কিনবে বলে এরা যথেষ্ট চেষ্টা করচে—কিন্তু এদের অর্থাভাব প্রায় আমাদের বিশ্বভারতীরই মতো—তবু কোনো রকম করে জোগাড় করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে।"

১৯৩০-৩১ সালে ইউরোপ ভ্রমণের সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রকলা প্রদর্শনী করে ওখানকার শিল্পীসমাজের কাছ থেকে প্রশংসা ও উৎসাহ পেয়ে ছবি আঁকার কাজে ডুবেছিলেন। কোপেনহেগেন থেকে লেখা একটি চিঠিতে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, (চিঠি নং ৯৫ ও ৯৬, ১৭ নভেম্বর ১৯৩১) "এতদিন ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম মধ্যোরূপায়, সম্প্রতি এসেছি কোপেনহেগেন—আকাশ থেকে যেমন প্রত্যহই বৃষ্টি পড়চে আমার বক্তৃতাধারাও তেমনি প্রত্যহই প্রবাহিত। আজও আছে কালও আছে পরশুও আছে। একদা ছিলুম বাণীবিলাসী এখন হয়ে পড়েছি বাণীবিরাগী। কথার কারবার করতে আর ভালো লাগে না। হয়ত ছবির নেশা তার একটা কারণ। বিশ্বাস করা শক্ত এগুলো সত্যিকারের ছবি,

এখানকার ওস্তাদরা তো তাই বলচে। তোমরাও বলেছিলে মন্দ হয়নি, কিন্তু কিছু যেন মৃদুস্বরে এবং অনেকখানি হাতে রেখে। এরা অনেকে বলচে যে আমাদের ছাড়িয়ে গেছে। চিত্রের পর্যায় নতুন নতুন আকারে দেখা দেবে। কেবল মাত্র এই আগ্রহে দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে— এটা নিভৃত কোণে রঙীন কালি নিয়ে আপন মনে রঙমহল সৃষ্টি করতে থাকব। এখানে পথ চল্‌তে চল্‌তে অনেক ছবি এঁকেচি। প্যারিসে যেগুলো এঁকেছিলুম এদের খুব ভালো লেগেছে। কোপেনহেগেনেও পরশু থেকে প্রদর্শনী খুলবে। রাশিয়ার শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ বার্লিনে আমার ছবি দেখে মস্কোর জন্যে দরবার করে গেছেন।…… যথাকালে সংবাদপত্রিকায় বিবরণের খণ্ড ও অখণ্ডাংশের তর্জমা পাঠাতে চেষ্টা কবব। রথী একতাড়া পাঠিয়েছে শোনা গেল। অমিয়কে এ সম্বন্ধে উৎসাহ দেবে, সে নানাবিধ সংবাদ কুড়িয়ে কুড়িয়ে ঝুড়ি ভর্তি করচে।"

৯৬ নং চিঠিতে (১৭ নভেম্বর ১৯৩১) অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশকে রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষে তাঁর নিজের আর্ট সম্বন্ধে বলছেন— "তুমি লিখচ সত্য উপলব্ধিতে বিশ্বমনের যে প্রকাশ সেটা বোঝা যায় কিন্তু রসের অনুভূতিতে বিশ্বমনকে হৃদয়ঙ্গম করি কিনা সন্দেহ থেকে যায়। অর্থাৎ অনুভূতিতে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ছাড়িয়ে গিয়ে শাশ্বত চরমতায় পৌঁছন যায় কিনা সেটাই বিচার্য। সৌন্দর্যবোধের চরম আদর্শ বিশ্বমনের মধ্যে পূর্ণ আছে, না, সে দেশ কাল পাত্রে নিরন্তর বিচিত্র? এই বোধ যদি ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে বস্তুতই পৃথক হয়ে থাকে, এর যদি সার্বমানবিক নিত্য মূল্য না থাকে তাহলে সুন্দরের প্রকাশে উৎকর্ষের বিচার চলতে পারে না। অন্তত সে বিচারের আদর্শকে অত্যন্ত পরিবর্তনশীল, প্রাদেশিক ও কৃত্রিম বলতে হয়। শিক্ষার দ্বারা সাধনার দ্বারা এই বোধের উচ্চতর বিকাশের কথাটাকেও অগ্রাহ্য বলতে হয়। কিন্তু মানুষের ইতিহাসে দেখতে পাচ্চি শিল্পসৌন্দর্য যেখানে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেচে সেখানে সকল কালের ও সকল দেশের মন

মিলিত হচ্চে। গ্রীসে রোমে চীনে ভারতে দক্ষিণ আমেরিকায় জাভায় জাপানে আদিম যুগের গুহা প্রাচীরে যে সব শিল্পসম্পদ দেখা দিয়েচে তাদের দেশ কাল ও জাতির পার্থক্য প্রভূত, তাদের বাহ্যরূপেও যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য, তবুও মানুষের আনন্দের সম্মতি এখানে বাধা পাচ্ছে না। এ কথা সত্য যে নিঃশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি কোনো শিল্প সামগ্রীতে এক জাতীয় রস পায় না। যেমন অনেকে আছে যারা বর্ণকানা তেমনি অনেকে রূপকানা—তারা নিজের ব্যক্তিগত বিশেষ অভিরুচির বাইরে দেখতেই পায় না—তারা যখন ভালো জিনিসকে বলে আমার ভালো লাগল না তখন চুপ করে যেতে হয়, কিম্বা বলতে হয় হতভাগার বিশ্বরসদৃষ্টি নেই। ··বুদ্ধি জিনিসটা অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য কিন্তু রুচিটা উপরি পাওনা। এমন কি সৌন্দর্য রুচির ক্ষুধায় অনেক সময় মানুষের স্বার্থহানি করে। যাদের সৌন্দর্যবোধ অসম্পূর্ণ সংসারে তারা সার্থকতা লাভ করে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই······কিন্তু সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে কোনো সাংঘাতিক তাগিদ নেই। এইজন্যে এদিকে মানুষের শৈথিল্য ঘটেছে। এই বিষয়ে যথেচ্ছাচার আছে বলেই যে সার্বমানবিক নিত্যবোধ মূলেই নেই তা আমি মানব না। যা বিশ্বজনীনভাবে সুন্দর, যা উৎকৃষ্ট, তার সঙ্গে সর্বত্র আমাদের সকলেরই চেতনার অনুকম্পন ঠিক তালে মেলেনি সে তো প্রতিদিনই দেখতে পাচ্চি কিন্তু তবুও তো হাল ছেড়ে দিয়ে বলচিনে তবে আর কেন, সাহিত্যে শিল্পে উৎকর্ষের সাধনা তো মরীচিকার অনুসরণ। সকল প্রকার বাধা-বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও অন্তরের মধ্যে জানি যে উৎকর্ষের আদর্শ আছে, তাকে উপহাস করলেও অস্বীকার করলেও সে আছে।···"

রবীন্দ্র-চিত্রকলা নিয়ে সেকালে অনেকে হেঁয়ালী করেছেন। তার উত্তর মিলবে কবির নিজের কথায়। দেশের চেয়ে বিদেশের গুণিজনের মন জয় করেছিল কতখানি, সে কথা কবি নিজেই বলেছেন। ওপরের চিঠি কটাই তার প্রমাণ।

ছোটবেলা থেকে আর্ট জগতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়। বিশেষ

করে জাপানী চিত্রকলার সঙ্গে। তারপর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগে লণ্ডনে ইংরেজ শিল্পী রোদেনস্টাইনের সংস্পর্শে এসে আর্টচর্চা তিনি বাড়িয়ে দেন। ইউরোপে এলেই তিনি মিউজিয়ম, আর্ট গ্যালারী দেখে বেড়াতেন। ১৯১৬ সালে জাপানে বেড়াতে গিয়ে ইয়াকোহামায় তাঁর থাকাব কথা ছিল কয়েক দিন কিন্তু তিনি সেখানে কাটালেন তিন মাস। কিন্তু কেন? ইয়াকোহামায় তাইকাওয়ান নামে এক শিল্পীর সঙ্গে আর্টচর্চা নিয়ে তিনি মেতে ছিলেন ওই সময়ে। তারপর ১৯২২ সালে কলকাতায় প্রদর্শনী হল পল ক্লি ও কাণ্ডিনিস্কির ছবিব। ১৯২৬ সালে তিনি জার্মানীতে গিয়ে ওঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করলেন এবং সুবরিয়ালিজম আর্ট নিয়ে চর্চা শুরু করলেন। তাব বহু আগে ১৯২৮ সালে কবি বিশ্বভারতীতে কলাভবন খুলেছেন। ১৯২৮ সাল থেকে ছবি আঁকাটা কবির কাছে প্রতিদিনের কাজ বলে মনে হত এবং তিনি আঁকতেনও নিয়মিত।

যে সময়ে ইউরোপেব সুররিয়ালিজম আর্ট আন্দোলন চলছে ঠিক সে সময়ে আরেকটি আন্দোলন চলে যাব নাম দেওয়া হয় 'নাইফ' অর্থাৎ সরল। যে আর্টে টেকনিকের মারপ্যাঁচ নেই। শিল্পীর সবল মনের অভিব্যক্তি। এই দলের নামকরা শিল্পীরা ছিলেন রুশো সেবাফিন, ভিবিন, বাম্বায়া, বোশঁ প্রমুখ এবং নেতা ছিলেন জার্মান চিন্তাশীল ভিলহেলম উড্। প্রসঙ্গত এই আন্দোলনের পীঠস্থান ছিল প্যারিস। বিশেষজ্ঞদের মতে রবীন্দ্র-চিত্রকলায় 'নাইফ' আন্দোলনের ছাপও পাওয়া যায়।

১৯৩০ সালের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ ফ্রান্সে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানকার একদল শিল্পীকে কবি তাঁর কিছু ছবি দেখান। তাঁরা উৎসাহিত হয়ে কবিকে প্রদর্শনী করতে অনুরোধ করেন তারই ফলশ্রুতি হল প্যারিসের গ্যালারী পিগালে রবীন্দ্র-চিত্রকলার প্রদর্শনী ১৯৩০ সালের মে মাসে। ওই প্রদর্শনীর ক্যাটালগের ভূমিকা লিখেছিলেন সাহিত্যিক মাদাম কাউণ্টেস্ আন্না দ্য নোয়াই।

১৯৩০ সালের জুন মাসে প্রদর্শনী হল লণ্ডনে ও বার্মিংহামে। ওই বছরের জুলাই মাসে হল বার্লিনের গ্যালারী ফার্দিনান্দ মোলার্-এ। তারপর মিউনিখ ও ডেনমার্কের শার্লোটেন-বুর্গ-এ। এরপর হল আগস্ট মাসে জেনেভায়। মস্কোয় বিরাটভাবে হল সেপ্টেম্বরে গ্যালারী গোসেগুদারস্তেন্নি মুজেই নোভোগো জাপাদনোগো ইসকুশতাভায়। নভেম্বরে হল নিউইয়র্কে ও ফিলাডেলফিয়ায়।

———

ফ্রান্স

প্রথম রবীন্দ্র চিত্রকলাব প্রদর্শনী হয় প্যারিসে ১৯৩০ সালের মে মাসে। তার বহু আগে তিনি নিয়মিত ছবি এঁকেছেন কিন্তু কাউকে দেখান নি কুণ্ঠা বোধ করে। দক্ষিণ ফ্রান্সে বেড়াতে গিয়ে কবি কিছু ফরাসী চিত্র সমালোচকদের দেখালেন তাঁর সৃষ্টি। তাঁরা তো দেখেই মুগ্ধ। বললেন—চমৎকাব, প্রথম শ্রেণীর আর্ট। এখনই একটা প্রদর্শনী করুন। তাঁদের উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে কবি প্যারিসের আর্ট গ্যালারী পিগালে প্রদর্শনী খুললেন। প্যারিসে রবীন্দ্র চিত্রকলা প্রদর্শনীর আয়োজন কে করেছিলেন তা নিয়ে অনেক বাক-বিতণ্ডা হয়েছে। কেউ বলেন শ্রীমতি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। আবার কেউ বলেন কাউণ্টেস আন্না দ্য নোয়াই।

ফ্রান্সের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় তাঁর প্রথম যৌবনে। ১৮৭৮-৮০ এবং ১৮৯০ সালে ইংলণ্ডে থাকার সময় তিনি একবার প্যারিসে যান। তারপব ১৯১২-১৩ সালে ইউরোপ-আমেরিকা ভ্রমণের সময়ে অল্প সময়ের জন্য প্যাবিস ছুঁয়েছিলেন।

কবি ফ্রান্সে তিনবাব বেশ দীর্ঘ সময় কাটান, ১৯২০ সালের গ্রীষ্মকালে, ১৯২১ সালের বসন্তকালে আর ১৯৩০ সালের বসন্তকালে। আবার ১৯২৬ সালের ইউরোপীয় ভ্রমণ সূচীতে ছিল ফ্রান্স। তার আগে ১৯২৪ সালে দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রার উদ্দেশ্যে ফ্রান্সে আরও একবার পদার্পণ কবেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ফ্রান্স কবির কাছে নতুন নয়। বহু-গুণ মুগ্ধ ও অনুরাগী ছড়িয়ে ছিল ফরাসী দেশ জুড়ে।

এমনি এক ফরাসী অনুরাগী মঁঃ আলব্যার কান্-এর বাড়িতে কয়েক-বার থেকেছেন কবি। প্যারিসের উপকণ্ঠে বুলইন-সুর-সেইনের ছোট্ট

শহরের কে দু কার্তর সেপ্তম্বর রাস্তার ধারে "অতুর দু ম'দ" বাড়ি। এটি ম'ঃ আলব্যার কানের বাড়ি। অতুর দ্য ম'দ অর্থাৎ ভূপ্রদক্ষিণ বাড়িতে প্রথমবার ছিলেন ১৯২০ সালে। সে বছর তিনি পুত্র-পুত্রবধূদেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর ১৯৩০ সালের বসন্তকালে আরেকবার থাকেন আলব্যার কানের বুলইনের বাড়িতে দলবল নিয়ে। আলব্যার কানের দক্ষিণ ফ্রান্সেব সমুদ্রোপকূল গ্রাম কাপ্‌ মার্তার বাড়িতে বিশ্রাম নেন কবি ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে। ওখানেই কিছু ফরাসী সাংবাদিক তাঁব সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিরাট বিরাট খবর ছাপে। রবীন্দ্র চিত্রকলা দেখেন এক ফরাসী সাংবাদিক নাম তার ম'ঃ ভি. রুজিয়েব। তার লেখা প্রকাশিত হয় রবীন্দ্র চিত্রকলা নিয়ে 'কমেডিয়া' পত্রিকায় ২৯ মার্চ ১৯৩০ সালে। তারপবই শুরু হয় রবীন্দ্র চিত্রকলা প্রদর্শনীর তোড়জোড়।

আলব্যার কানেব বাড়িতে থাকাব সময়ে কাবব সঙ্গে নিয়মিত দেখা শোনা হ'ত হয় প্যারিসে, নয় তো বুলইনে বোমাঁা বোল', আঁদ্রে ও সুজান কার্পেলে, কাউন্টেস আন্না দা নোয়াই, দার্শনিক বার্গশ' এবং সিলভা লেভির সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথের ফবাসী গুণমুগ্ধ ও অনুরাগীর সংখ্যা যে কম নয় তার প্রমাণ পেয়েছি রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে ১৯৬১ সালে। ফরাসী সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আযোজিত রবীন্দ্র শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানগুলো ছাড়াও বে-সরকারী অনুষ্ঠান, রবীন্দ্র নাট্যানুষ্ঠান প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। আলব্যার কানের উত্তরসূরীরা তাঁদের বুলইনের বাড়িতে রবীন্দ্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন এক মাস ধরে। বুলইনের যে বাড়িতে কবি থাকতেন, সে বাড়িতে গিয়ে দেখি যেন রবীন্দ্রতীর্থ। কবির ব্যবহৃত জিনিস, চিঠিপত্র, ছবি, বই ইত্যাদি নিয়ে আলব্যার কানের বাড়ির লোকেরা সুন্দর প্রদর্শনী খুলেছিলেন ১৯৬১ সালে।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে ফ্রান্সে কী ভাবে ফরাসীরা শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সে সম্বন্ধে ১৯৬১ সালের ২৪ জুন 'যুগান্তর' পত্রিকায় আমার লেখা এক

পূর্ণ বিবরণী ছাপা হয়। ওই সময়ে আমি প্যারিস থেকে নিয়মিত লিখতাম যুগান্তর পত্রিকায় 'প্যারিসের চিঠি'। সেই দিনের রিপোর্টে যা লিখেছিলাম তার হুবুহু তুলে দিচ্ছি। তা থেকে বুঝবেন ফরাসীরা কত শ্রদ্ধাভরে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পালন করেছিল।

"প্যারিস ১৮ই জুন ১৯৬১—বিগত একটি সপ্তাহ প্যারিসে রবীন্দ্র সপ্তাহ গেছে বললে ভুল বলা হবে না। সপ্তাহ ধরে চলে প্রায় প্রতিদিন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিভিন্ন সম্মেলন।

প্যারিসে ববীন্দ্র শতবার্ষিকী শুরু হয়েছে গত বছরে নভেম্বর মাসে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত গোটা-পনের সভা-সম্মেলন, জলসা, নাটকাভিনয় হয়ে গেছে এবং এ বছরটা ধরে আবও হবে। এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে যে কত ববীন্দ্র-সভা হয়েছে তার হিসেব দেওয়া মুশকিল। তবে অধিকাংশই ছোটখাট স্বাধীনভাবে অনুষ্ঠিত। সরকারীভাবে ফরাসীরা 'রবীন্দ শতবার্ষিকীর জাতীয় কমিটি' গঠন করেছে জানুয়ারী মাসে, যার পৃষ্ঠাপোষকতা করেছেন ফ্রান্সের সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী মঁ আদ্রেঁ মালরো, পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঁ কুভ্ দ্য মুরভিল্ ও শিক্ষামন্ত্রী মঃ লুসিয়াঁ পেই, সাহিত্যিক জঁ কক্‌তো ও আরও অনেকে। কার্যকরী কমিটির সভাপতি হলেন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় সভ্যতা ইতিহাসের অধ্যাপক লুই রণু।

ফ্রান্সের জাতীয় কমিটির তরফ থেকে ইতিমধ্যে তিন-চারটে সভার অয়োজন করা হয়েছিল এবং সেগুলো সার্থকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ৭ জুন তারিখে উক্ত কমিটির প্রচেষ্টায় একটি ছোট সভার আয়োজন হয় প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এ্যাস্তিতুত দ্য সিভিলিজাশিয়ঁ এ্যাঁদিয়ান্' (ভারতীয় সভ্যতা পরিষদ)-এ। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক লাকম্ব্, প্রধান বক্তা ছিলেন সাহিত্যিক শ্রীবুদ্ধদেব বসু। রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বুদ্ধদেববাবু মানুষ রবীন্দ্রনাথের অনেক অজানা কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, সবাই ভাবেন কবিতা লিখতে হলে চাই কবিত্বময় পরিবেশ। অনেক কবিও নাকি পরিবেশ

না পেলে লিখতে পারেন না। তাঁদের কলম দিয়ে কবিতা বেরোয় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবিত্বময় পরিবেশ ছাড়াই এমন কি রেলগাড়ীর কামরায় বসে রেলগাড়ীর ঝাঁকুনিতেও লিখেছেন অজস্র কবিতা। তিনি কলম ধরলেই ঝরণা ধারায় বেরিয়ে আসত কবিতা।

"ওই সভায় মঁঃ আল্যাঁ দানিয়েলু রবীন্দ্র সঙ্গীতের ব্যাখ্যা করে শোনান। তারপর ব্যাখ্যা নয় সত্যিকারের রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে শোনান শ্রীমতী বাজেশ্বরী দত্ত।

"৮ জুন রাত্রে প্রাচ্য সুহৃদ সমিতির প্রচেষ্টায় মুজেগিমের হলে দেখান হয় আমাদের ফিল্ম ডিভিশনের দুটো ডকুমেণ্টারী ছবি, তার সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের তোলা ছবি রবীন্দ্রনাথ।

"৯ জুন ফরাসী জাতীয় কমিটি 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন' জানিয়ে সভার আয়োজন করে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের রিশ্যলু হলে। রাত ৯টায় আরম্ভ হয় অনুষ্ঠান, গিয়ে দেখি হলের গ্যালারি পূর্ণ। তিল ধারণের স্থান নেই। প্রচুর সংখ্যক দর্শক ও শ্রোতা বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। এমন কি, সিঁড়ির ওপর বসে অনেকে শুনছেন। ওইদিন রাত ন'টায় শুরু হয় অনুষ্ঠান। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক লুই রণু। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথকে বলা উচিত ঋষি। পরের বক্তা অধ্যাপক লাক্ম্ব রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টিকে বলেছেন 'তপোবন।' তিনি বলেছেন যে, বন ও তপোবনে বেশ তফাৎ আছে। তপোবনে বসে সাধনা করা যায়, বনে বসে নয়।

"ফরাসী সাহিত্যিক সমিতির সভাপতি মঁঃ ফ্রান্সিস দিদেলো রবীন্দ্র সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের আলোচনা করেন। তারপর ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বলেন যে, "এখানে আমি ইংরেজী ভাষায় বলছি, যে ভাষা আমারও নয় আপনাদেরও নয়, সুতরাং ক্ষমা করবেন। বরং রবীন্দ্রনাথ যে ভাষায় লিখেছেন সেই বাংলা ভাষা আমার মাতৃভাষা এবং সেই ভাষায় বক্তৃতা করতে পারলে আমি সবচেয়ে গৌরব বোধ করতাম।

"ওই সভার দ্বিতীয় পর্বটি ছিল রবীন্দ্র সঙ্গীতের। রবীন্দ্র সঙ্গীতের ব্যাখ্যা করেন মঁঃ দনিয়েলু এবং তার প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের দুখানি গান ফরাসীতে গেয়ে শোনান মঁঃ পিয়ের জনরে, পিয়ানো বাজান মঁঃ কার্লো বাং 'খড় বায়ু বহে বেগে'-র ফরাসী ভাষ্য হয়েছিল চমৎকার। দুখানি রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে শোনান শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্ত। তারপর প্যারিসের ভারতীয় ছাত্রের একটি দল রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন।

"রবীন্দ্র কমিটির আয়োজনে শুক্রবার ১০ জুন, প্যারিস রেডিও থেকে প্রচারিত হয় দেড় ঘণ্টায় 'রবীন্দ্র স্মরণ' অনুষ্ঠান। রবীন্দ্র সঙ্গীতে ও কথিকায় রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে বলেন, মঁঃ পিয়ের আমাদো, অধ্যাপক মেল্, অধ্যাপক লাকম্ব, মঁঃ দানিয়েল্যু। তারপর রেডিও আর্টিস্টরা অভিনয় করে ফরাসী ভাষায় 'রাজা'। রেডিও প্রচারিত কথিকা, সঙ্গীত ও 'রাজা' অভিনয় সকলের ভাল লেগেছে। প্যারিস রেডিও থেকে আরও তিনটি রবীন্দ্রানুষ্ঠান প্রচারিত হয়। এবারকার রবীন্দ্র সভা সম্বন্ধে প্যারিসের অনেকগুলো পত্রিকাই সংবাদ পরিবেশন করেছিল।

"১৩ জুন, এখানে থিয়েটার ল্যভ্রএ রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' অভিনীত হচ্ছে ফরাসী ভাষায়। ২৫ জুন, থিয়েটার ভিয়ো কলম্বিয়েতে কিছু ফরাসী সাহিত্যিক রবীন্দ্র কবিতার আবৃত্তি করেন এবং সঙ্গতীও পরিবেশন করেন।

"ফ্রান্সে বিশেষ করে প্যারিসে রবীন্দ্রসভার আয়োজন করছেন ফরাসী চিন্তাশীল মহল শ্রদ্ধা সহকারে। রবীন্দ্রানাথের ওপর অনেকগুলো ফরাসী বই ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে। সেদিন কাফেতে বসে আছি অনেকদিন পর এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। বন্ধুবর বলে উঠলেন যে, রবীন্দ্র সাহিত্য ওকে মুগ্ধ করেছে। ফরাসী ভাষায় যা পেয়েছেন তাই গিলেছেন। মূল ভাষায় পড়তে না পারার দরুণ অনেক আফ্‌শোষ করল ছেলেটা। রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিদেশীদের শ্রদ্ধা এখানেই বোঝা যাবে।

"রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবদেন নিয়ে ফরাসীরা অনেক সভার আয়োজন করেছে। প্যারিসে ভারতীয় দূতাবাসের তরফ থেকে অন্তত একটি রবীন্দ্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা উচিত ছিল। প্যারিসে ভারতীয় দূতাবাসে একটি সংস্কৃতি দপ্তর আছে। সেই সংস্কৃতি দপ্তরের তরফ থেকে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হওয়া উচিত ছিল। আরও উচিত ছিল এই সংস্কৃতি দপ্তর থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ফরাসী ভাষায় ছোট পুস্তিকা প্রকাশ।"

১৯৬১ সালের সারা বছর ধরেই চলে ফ্রান্সময় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী। তার শেষ পর্যায়ে যা সব অনুষ্ঠান হয় যে সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট পাঠাই যুগান্তরে। আমার 'প্যারিসেব চিঠি'-তে ছাপা হয় ১৬ জানুয়ারী ১৯৬২ সালে। তার থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি।

"প্যারিস, ডিসেম্বর ১৯৬১—ফ্রান্সের রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর জাতীয় কমিটিব শেষ কর্মসূচী হিসেবে 'বিব্লিওথেক নাশিওনাল'-এ (জাতীয় গ্রন্থাগার) রবীন্দ্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়েছে ২৫ নভেম্বর, চলেছে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত। রবীন্দ্র প্রদর্শনীতে দেখান হয়েছে রবীন্দ্রনাথেব আঁকা ছবির সংগ্রহ, রবীন্দ্রনাথের লেখা কয়েকখানা বাংলা বই, কিছু ইংরেজী অনুবাদ আর ফরাসীতে অনূদিত বইগুলোর সংগ্রহ। আরও ছিল রবীন্দ্রনাথের ফটো, শান্তিনিকেতনের ছবিসহ ইতিবৃত্ত, রবীন্দ্রনাথের সাথে রোম্যাঁ রোলাঁ ও আঁদ্রে জিদের চিঠিপত্রের আদান-প্রদান। তাছাড়া ছিল রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ ভ্রমণের কতকগুলো ছবি এবং কবির প্যারিস অবস্থানকালের ছবিগুলো। রবীন্দ্র চিত্রকলার প্রথম প্রদর্শনী হয় প্যারিসের পিগাল গ্যালারীতে, তার কয়েকটা ছবি ঐতিহাসিক।

রবীন্দ্র সাহিত্যের যতগুলো গ্রন্থ ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে তার অধিকাংশ ফরাসীতে অনূদিত হয়েছে। অনেক বই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে বেরিয়েছিল, সেগুলো এখন আর পাওয়া যায় না। সেগুলোর হদিস পাওয়া গেল এই প্রদর্শনীতে। প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ এই উপলক্ষে

একটি রবীন্দ্র-স্মরণী গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। বইটাতে আছে রবীন্দ্র-জীবনী, রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জীর পূর্ণ বিবরণ ও ইতিহাস। ভবিষ্যতে যাঁরা রবীন্দ্র সাহিত্যের ওপর গবেষণা করবেন তাঁদের এই গ্রন্থটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে। প্রদর্শনীতে কৌতূহলের ভীড় লেগে ছিল।

রবীন্দ্র প্রদর্শনী উপলক্ষে বিখ্যাত সাহিত্য সাপ্তাহিক 'লে লেত্‌র ফ্রাঁসে (যার সম্পাদক কবি আরাগঁ) পত্রিকায় 'রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি, প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে এখানকার বিখ্যাত প্রকাশক 'গালিমার' কোম্পানী রবীন্দ্র-কবিতা সঙ্কলন প্রকাশ করেছেন। বইটি এত সুন্দরভাবে ছাপান ও বাঁধান যে তাতে সামান্য দাগ ফেলতে কষ্ট হবে। তার ওপর রয়েছে রবীন্দ্রনাথের ছবি থেকে তাঁর আঁকা চিত্রের ছবি, আর আছে মুঘল যুগের কিছু ভারতীয় চিত্রের ছবি। বাংলা বা ইংরেজী ভাষায় রবীন্দ্রনাথের কোনো বই এমন পরিপাটি ও সুরুচিসম্পন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার তো অন্তত জানা নেই। গ্রন্থ মুদ্রণ ও সম্পাদনাও যে একটা আর্ট তার পরিচয় মিলবে এই বইটি থেকে। ফরাসী ভাষায় রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা ও কয়েকটি গল্পের আরও একটি সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে, যার প্রচ্ছদপট এঁকেছেন বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর পিকাশো। তার ওপর রয়েছে কতকগুলো চমৎকার ছবি।"

ফরাসী সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল; সেকথা আগেই বলেছি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের যে ক'জন ফরাসী সাহিত্যিক ছিলেন 'আধুনিক' ও প্রথম শ্রেণীর তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত এবং সেই সব ফরাসী কবি সাহিত্যিকরা রবীন্দ্রনাথকে প্রীতির চোখে দেখতেন তার পরিচয় আমি পেয়েছি বহুবার দীর্ঘ ফ্রান্স প্রবাসে।

দুই ফরাসী কবি পল্ ক্লোদেল এবং দুআমেল রবীন্দ্রনাথকে শুধু

চিনতেন না তাঁরা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বহু লেখা লিখেছেন, বিভিন্ন সময়ে ফরাসী পত্র-পত্রিকায়।

রোম্যাঁ রোলাঁকে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গদের মধ্যে ধরা হয়। কিন্তু আরেকজন ফরাসী সাহিত্যিক আন্তর্জাতিক খ্যাতিতে রোম্যাঁ রোলাঁর চেয়ে খাটো নন। তিনি নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত। আমি আঁদ্রে জিদ্-এর কথা বলছিলাম। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভের সামান্য কিছু আগে লণ্ডনে গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ওই সময়ে কবির সঙ্গে আঁদ্রে জিদ-এর কেমন করে আলাপ হয় তার বিস্তৃত বিবরণ আমরা জানিনা। গীতাঞ্জলির একখানা ইংরেজী অনুবাদ হাতে পেয়ে আঁদ্রে জিদ্ মোহিত হয়ে পড়েন। ওটার ফরাসী অনুবাদে হাত দেন তৎক্ষণাৎ আঁদ্রে জিদ্। আঁদ্রে জিদ-এর ফরাসী অনুবাদ গীতাঞ্জলির নাম রাখা হয় 'ল্যফরন্দ লিরিক্'। প্রকাশ করেন প্যারিসের প্রকাশক সংস্থা 'গালিমার' ১৯১৪ সালে। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকটির ফরাসী অনুবাদকও আঁদ্রে জিদ। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' ফ্রান্সে চিন্তাশীল মহলে পরিচিত নাটক। বছরে একবার না হক এক-দুই বছর অন্তর এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। আমি তো পনের বছরে অন্তত সাত-আটবার অভিনীত হতে দেখেছি।

আরেকজন নোবেল প্রাইজ পাওয়া ফরাসী সাহিত্যিক বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে রবীন্দ্র অনুরাগী। ইনি কবি স্যাঁ জন প্যার্স। কবি স্যাঁ জন প্যার্স জনগণের কবি নন। ইনি চিন্তাশীলদের কবি। এঁর লেখার ঢং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রতিটি কাব্য দর্শন ঘেঁষা।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যত লেখা প্রকাশিত হয় ফ্রান্সে তার মধ্যে স্যাঁ জন প্যার্সের লেখাটাকে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করি।

ফরাসী কবি স্যাঁ জন প্যার্স ১৯৬০ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেও তিনি কিন্তু ফরাসী জনসাধারণের কাছে তেমন পরিচিত নন। ফরাসী জনসাধারণের মধ্যে আমি এমন অনেককে দেখেছি যে, তারা

শিক্ষিত, স্যাঁ জন প্যার্সের নাম শুনেছে কিন্তু তাঁর কবিতা পড়েনি এদের সংখ্যাই বেশী।

স্যাঁ জন প্যার্স জনপ্রিয় নন তার প্রধান কারণ, তিনি সহজ-সরল ভাষায়, চিরাচরিত প্রথায় পয়ার বা ছন্দ মিলিয়ে কবিতা গাঁথেন নি। ভাষার দিক দিয়ে তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ছন্দের দিক দিয়ে সুধীন দত্ত বা বিষ্ণু দে। তার ওপর আরও আছে। তাঁর কবিতা যেন দার্শনিক প্রবন্ধের কাব্যিক আকার। এ হেন দার্শনিক কবি যখন ফরাসী সাহিত্যে জাঁকিয়ে বসতে পাবেন নি, সেই সময়ে অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে রবীন্দ্রসাহিত্যের সাথে ফরাসী সাহিত্যিক মহলে পরিচয় করিয়ে দেন স্যাঁ জন প্যার্স।

ফরাসী সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম, যিনি রবীন্দ্রনাথের সাথে শুধু প্রথম আলাপ নয়, তাঁর গীতাঞ্জলি যাতে ফরাসীতে অনূদিত হয় তার ব্যবস্থা করেন। স্যাঁ জন প্যার্স গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদটি সংগ্রহ করে প্রথমে পড়তে দেন আরেক নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ফরাসী সাহিত্যিক আঁদ্রে জিদ্‌কে। পরে আঁদ্রে জিদ্ গীতাঞ্জলির ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত করেন। গীতাঞ্জলির ফরাসী অনুবাদের পর থেকে ফরাসী সাহিত্যিক ও পাঠক মহলে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি কৌতূহল বাড়তে থাকে। যার ফলে বছরের পর বছর ধরে রবীন্দ্রসাহিত্য ফরাসী ভাষায় অনূদিত হতে থাকে এদিক দিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগী মাত্রেই স্যাঁ জন প্যার্স-এর কাছে ঋণী।

ফরাসী সাহিত্য-পত্রিকা 'লা ন্যুভেল রভ্যু ফ্রাসেঁজ'-এর নভেম্বর ১৯৬১ সংখ্যায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে কবি স্যাঁ জন প্যার্স যে প্রবন্ধটি লিখেছেন, সেটি অমূল্য। এত ছোট প্রবন্ধে রবীন্দ্রদর্শন এমন পরিষ্কারভাবে কেউ ব্যক্ত করতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই। আমার মনে হয় তা স্যাঁ জন প্যার্সের মত ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর পরিচয় পর্ব সম্বন্ধে প্রথমে বলি। প্রথম.

মহাযুদ্ধের পূর্বে ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয় লণ্ডনে। তখন কিন্তু তিনি সঁ্যা জন প্যার্স বলে পরিচিত নন। সঁ্যা জন প্যার্স তাঁব ছদ্মনাম। আসল নাম হল আলেক্সি সঁ্যা লেজে। আলেক্সি সঁ্যা লেজে তখন ফরাসী পররাষ্ট্র দপ্তরে উচ্চপদস্থ কর্মচারী। লণ্ডনের ফরাসী দূতাবাসে কর্মনিরত। তখন তিনি ছদ্মনামে লিখতেন। তখনকার ছদ্মনাম ছিল সঁ্যা লেজে। সরকাবী চাকরির ফাঁকে সাহিত্যচর্চা চলছে তখন তাঁর। শিল্পী ও দার্শনিক মন কখনো সরকারী ফাইলের স্তূপে ঢাকা থাকতে পারে না, সে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবেই। তাঁর প্রমাণ সঁ্যা জন প্যার্স।

লণ্ডনে তখন রবীন্দ্রনাথের বিজয়পতাকা উড়ছে। ইংরেজ সাহিত্যিকরা জটলা করছে রবীন্দ্রপ্রতিভা নিয়ে। সেই জটলায় যোগ দেন সঁ্যা জন প্যার্স। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রপ্রতিভায় সঁ্যা জন প্যার্স ডুবে যেতে বাধ্য হন। তাঁব নিজের কথায়। "তখনও মহাযুদ্ধ বাধেনি। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে তাঁব সাথে লণ্ডনে হল পরিচয়। আমি ফবাসী যুবক, তিনি আমার চেয়ে তখন বছব ত্রিশেক বড। আলোচনা চলছিল পশ্চিমের ভবিষ্যৎ নিয়ে।

"লণ্ডনের সাউথ কেনসিংটন-এর এক বাড়িতে বসে আমাদেব আলোচনা চলছিল সমকালীন ইতিহাস নিয়ে। তখন পশ্চিমী শক্তির রবি মধ্যগগনে, তার আধিপত্য জগৎ জুড়ে। পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলোর কারখানার চিমনি দিয়ে নির্গত হচ্ছিল শক্তি ও শিল্পপ্রসারের ধোঁয়া। বিজ্ঞানের সাথে সাহিত্য ও শিল্পের জয়যাত্রা বয়ে চলেছে তখন ইউবোপ জুড়ে। পশ্চিমের মানুষ তখন কামারশালায় লোহা পিটছে। নির্মাণ করছে হাতিয়ার···। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর সন্দেহ প্রকাশ করে আমায় সব বললেন।

"তাঁর সবচেয়ে দুঃখ তখন যান্ত্রিকতার অতি বাড়াবাড়ি। অতিমাত্রায় শিল্প সমৃদ্ধি ও কলকারখানার বিষম পরিণতির কথা তাঁকে নাড়া দিয়েছে। সভ্যতার সংকট থেকে সভ্যতার ধ্বংস যে আসছে তা

তিনি তখনই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, সমষ্টিগত মানুষ থেকে একলা মানুষের ধ্বংস কিভাবে এগিয়ে আসছে।

"তা হলে সমস্যার সমাধান? কোন পথে তার সমাধান, কোন পথে সে এগুবে? তাঁর কাছে আধ্যাত্মিক পথই ছিল শ্রেষ্ঠ, তাতেই মানবের রক্ষা ও উন্নতি। তাঁর কিন্তু তখন পশ্চিমী অতিমাত্রায় 'প্র্যাগমাটিজম্'-এর প্রতি আস্থা নেই। কারণ তাব মতে পশ্চিমী 'প্র্যাগমাটিজ্‌ম' সংকট থেকে সভ্যতাকে বাঁচাতে সক্ষম নয়। তাঁর আস্থা ছিল ফরাসী মানবতাবাদীদের প্রতি। তাঁর শ্রদ্ধা ছিল ফরাসী উদারনীতি ও স্বাধীনতার বাণীর প্রতি।

"আমার কাছে তিনি জানতে চাইলেন ফরাসী সাহিত্যিকদের সাথে আলাপ-পরিচয়ের পথগুলো। আমার আরেক বন্ধু আঁদ্রে জিদের সাথে তাঁর আলাপের ব্যবস্থা করেছিলাম। আরও অনেকের সাথে।... যুদ্ধের পব অনেক কাল তাঁর সাথে দেখা হয়নি। আমি যখন চীনে, তিনি তখন জাপানে। বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পেলাম তিনি তখন চলেছেন আমেবিকাব দিকে। পশ্চিম থেকে পূর্বে। কিন্তু সে পূর্বও পশ্চিমী সভ্যতাব কেন্দ্র। তিনি প্রাচ্যের পবিব্রাজক, চলেছেন মৈত্রীর বাণী প্রচার করতে। ভাবাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি চলেছেন মানুষে মানুষে আত্মা ও প্রেমের বিনিময় কবতে। কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্ত্য তাঁর একই গান—মৈত্রী। মানুষেব মহত্ত্ব প্রচার কবতেই তিনি তখন পদব্রজে বেরিয়েছিলেন। মনুষ্য আত্মার প্রতিরক্ষাতেই।

"তাঁব পেছনে ছিল শাশ্বত ভারত। কত ঝড় বয়ে গেছে তার ওপর দিয়ে। ইতিহাসের ঝড়-বৃষ্টি তাকে ধুইয়ে দিয়ে তাকে রেখেছে পরিষ্কৃত কবে। ভাবতেব ভাগ্য যেন মানুষেরই ভাগ্য।

"রবীন্দ্রনাথেব প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন মানে ফরাসীদের সর্বোচ্চ আদর্শ মানবতাবাদের প্রতিই শ্রদ্ধানিবেদন।

"আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সবার ওপরে, এমনকি তাঁরই

অধ্যাত্মবাদেরও ওপরে। তার উজ্জ্বল ললাটে দেখা যেত দুই রশ্মির বিবরণ : কবি হিসেবে তিনি কবিদের স্বপ্নকেও ছাড়িয়ে গেছেন। আর তাঁর কাব্য দেশ-কাল-পাত্রের অতীত। সে চিরন্তন। খুঁজে বেড়িয়েছে সে মানুষের উৎস, অন্তহীন মানুষের সত্তা। যার ছিল না আদি ও অন্ত, অশেষ তার আশা ও আকাঙ্ক্ষা।

"তিনি ছিলেন যেমন চিরযুবক তেমনি তাঁর কবিতা। তাঁর যশোগৌরব লুকিয়ে রয়েছে তাঁর কাব্যে, তিনি পূর্ণভাবে জীবন্ত তাঁর কবিতায়, সে জানে প্রতিটি প্রাণীর জীবনস্পন্দন।

"তিনি আমাদের পশ্চিমের সমাজে এখনও জীবন্ত। তাঁর গীতাঞ্জলির মধ্য দিয়ে তিনি করছেন বিচরণ। একমাত্র গীতাঞ্জলি ; গীতাঞ্জলিই যেন এশিয়াব কোন এক বৃহৎ বটবৃক্ষের মতন। প্রকাশ করেছেন তিনি বিশুদ্ধ আত্মার আর্ট যার সাথে রয়েছে রহস্যময়ীব আঘ্রাণ ; আরও রয়েছে আত্মার দিগ্‌বিজয়।

"তাঁর দূরের বাণী আমাদের করেছে নিকট ; তাঁর প্রাচ্যসঙ্গীত আমাদের দিয়েও গাইয়েছেন সর্বত্র। তাঁর স্বদেশী মৌসুমী বাতাস বইয়েছেন আমাদের দেশে, শিখিয়েছেন তাঁর দেশের আচার। ফরাসীদের কানে সে সুব নতুন হলেও তাতে ছিল আন্তর্জাতিক আত্মাব ডাক। সেখানেই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব।

"তিনি আমাদের মধ্যেই বিরাজ করছেন, যেন রূপকথারাজ্যের অতিথি। শুভ্র তাঁর বেশভূষা, এনেছেন তিনি নতুন বার্তা। অতি অল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যে তিনি সুন্দর, দার্শনিকের চেয়ে সুমধুর কণ্ঠে গেয়েছেন মানুষের জয়গান। সুমধুর তাঁর চাহনি। যেন সবটাই রূপকথার রাজ্য। সেই রূপকথার রাজ্যে তিনি আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন তাঁর যৌবনের কবিতা, সে যেন অতি সাধারণ মানুষের অব্যক্ত বাণী।

"এমনি এক যুগসন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ালেন আমাদে মাঝে। দুই জগতের মাঝে তো বটেই, দুই কালের মাঝে। বিরাট পুরুষ তিনি

শতাব্দীর বাইরে, আবার তিনি ভেতরেও, একাধারে তিনি অতীত-কালের কবি আবার অন্য দিকে তিনি আজকের। কারণ তিনি কালজয়ী।

"ক্ষীণজীবী মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় যতখানি তিনি ব্যথিত হয়েছেন, ঠিক ততখানি ব্যথা পেয়েছেন তাঁর সমকালীন মানুষের ও সমাজের বেদনায়। ইউরোপে তিনি এসেছিলেন তাঁর বাণী শোনাতে, সমাধিস্থ হতে নয়। আরও দেখেছি তাঁর স্বদেশপ্রেম, তাঁর স্বচ্ছ বিচার-বিশ্লেষণ।

"তাঁর মৃত্যুর অনেককাল পরে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ দেখে তাঁর ঐশ্বরিক বাণীর কথাই মনে করিয়ে দিয়েছে বারবার। যে সম্বন্ধে আমি তাঁর সাথে আলোচনা করেছি অনেক কাল আগে। প্রাচ্যের রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্যের মানুষকে যা বলেছিলেন বহু আগে, তার ফল আমরা দেখলাম। কবি রবীন্দ্রনাথ তাই এখনও জীবিত। ফ্রান্স তাঁর প্রতি আস্থা রাখে, করে শ্রদ্ধা। ভারতের সেই মহান পরিব্রাজক এখনও আমাদের পথ দেখিয়ে চলেছেন।

"তাঁর মর্মবাণী এখনও আমাদের মধ্যে জাগ্রত। তাঁর বাণী প্রতিটি আত্মার মধ্যে জেগে উঠুক। এই আমার কামনা।"

রবীন্দ্র চিত্রকলার প্রথম প্রদর্শনী প্যারিসে হয় বলেই আমাকে এত কথা বলতে হল যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ফ্রান্সের বা তার চিন্তাশীল মহলের পরিচয় বহুকালের এবং কত ঘনিষ্ঠ ছিল। সুতরাং রবীন্দ্র চিত্রকলা প্রদর্শনীর আয়োজনে কিছু ফরাসী রবীন্দ্র-অনুরাগী এগিয়ে আসবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

শ্রীমতি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো একজন অকৃত্রিম রবীন্দ্র-অনুরাগীণী। রবীন্দ্র চিত্রকলার প্রদর্শনীর কথা শুনে তিনি সুদূর আর্জেন্টিনা থেকে প্যারিসে আসেন। প্যারিসে রবীন্দ্র চিত্রকলা প্রদর্শনী সাজাবার কাজে হাত বাড়িয়ে দেন শ্রীমতি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। রবীন্দ্র চিত্রকলার সঙ্গে শ্রীমতি ওকাম্পোর পরিচয় বহু আগে থেকে। রবীন্দ্রনাথ যখন

আর্জেন্টিনায় তিন মাস শ্রীমতি ওকাম্পোর অতিথি ছিলেন, তখন ওকাম্পোর উৎসাহে কবি বহু ছবি এঁকেছেন। সেটা ১৯২৪ সাল।

শ্রীমতি ওকাম্পো বলেছেন: 'কবি তাঁর পাণ্ডুলিপি কেটেকুটে অসুন্দর করতেন না। কলমের ডগা দিয়ে নানা রকমের পক্ষী-পাখালি বা কাল্পনিক প্রাণীর ছবি ফুটিয়ে তুলতেন। মিরালরিয়াতে যখন তিনি কবিতা লিখতেন, তখন তাঁব পাণ্ডুলিপিতে ঐসব দেখেছি। তখন তাঁর আঁকার মধ্যে এক বিরাট অঙ্কন শক্তি আবিষ্কার করেছিলাম।

ওঁর একটা ছোট খাতা টেবিলে পড়ে থাকত, ওরই মধ্যে কবিতা লিখতেন বাংলায়। বাংলা বলেই যখন তখন খাতাটা খুলে দেখা আমার পক্ষে তেমন দোষের ছিল না। এই খাতা আমাকে বিস্মিত কবল, মুগ্ধ করল।

তাঁর লেখার মধ্যে আঁকি-বুঁকি থেকে বেরিয়ে আসত সব বকম মুখ, প্রাগৈতিহাসিক দানব, সরীসৃপ অথবা নানা আবোল-তাবোল। একদিন কাকুতি কবে বললাম, এর কয়েকটি পৃষ্ঠাব ছবি তুলতে দিতে হবে আমায়।

আমাকে খুশী কববাব জন্য রাজী হলেন কবি। সেই ছোট খাতাটাই হলো শিল্পী ববীন্দ্রনাথেব সূচনা পর্ব। সান ইসিদ্রোর ছ' বছর পর প্যাবিসে যখন দেখা হল কবির সঙ্গে তখন ওঁর খেলা দাঁড়িয়ে গেছে ছবিতে।

সেদিন কবিকে চিত্রাঙ্কনে মনোনিবেশ করতে প্রচুর উৎসাহ দিয়েছিলাম। কবি চুপ করে আমার কথা শুনলেন, কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না। এর কয়েকদিন পর তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন—'বিজয়া, উৎসাহে আমি এ কাজ করব। তবে তুলি দিয়ে আমি ছবি আঁকব না। কলম দিয়েই তুলির কাজ সম্পন্ন করব। যে কলম দিয়ে কথার কাব্য লিখি, সেই কলমে রং এবং রেখার কাব্য লিখতে পাবি কিনা, তারই একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে চাই।'

প্যারিসে গ্যালারী পিগালে যেদিন রবীন্দ্র চিত্রকলা প্রদর্শনীর

উদ্বোধন হল সেদিন কবিকে নিয়ে একটি গ্রুপ ছবি তোলা হয়। ওই ছবিতে দেখা যায় কাউন্টেস্ আন্না দ্য নোয়াই, পল্ লেওঁ—সরকারি চিত্রকলা বিভাগেব ডিরেক্টর, ববীন্দ্রনাথ, ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো এবং ফ্রান্সিস্ দ্য ক্রোয়াশে।

প্যারিসেব গ্যালাবী পিগালে রবীন্দ্র চিত্রকলাব প্রদর্শনী চলে ৫ থেকে ১৯ মে ১৯৩০ সালে। ওটিব আয়োজনে ছিলেন পিগাল থিয়েটাবের ললিত কলাবিভাগ এবং প্যাবিসের 'আসোসিয়েশঁ ফ্রাঁসেজ দেজ আমি দ্য লরিয়ঁ'—ফ্রান্সের প্রাচ্য সুহৃদ সমিতি। এই উপলক্ষে একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। যাব ভূমিকা লেখেন কাউন্টেস আন্না দ্য নোযাই এবং তাতে ছিল চিত্র পবিচিতি ক্যাটালগ। সব শুদ্ধ একশ চাব্বিশটি ছবি প্রদর্শিত হযেছিল। রবীন্দ্র চিত্রকলা প্রদর্শনী উপলক্ষে পুস্তিকায় কাউন্টেস দ্য নোয়াইযেব লেখা প্রবন্ধ 'লে বেভ্ ভিজিবল্ দ্য ববীন্দ্রনাথ টাগোর' পুনরায় ছাপা হয তার পবের দিন (৫ মে ১৯৩০) 'লে নুভেল লিত্‌বেয়াব' পত্রিকায়। তারই ইংরেজী অনুবাদ পরে প্রকাশিত হয় মডার্ণ বিভ্যুতে নভেম্বব ১৯৩০। ওটি লিখেছিলেন মিঃ আব. এম. ঋিলওয়ার্ড। প্রবন্ধটিব নাম ছিল 'রবীন্দ্রনাথ ট্যোগোর্স পেইন্টিং'। আন্না দ্য নোয়াইয়েব লেখা অনূদিত হয়ে ছাপা হয় 'রবীন্দ্রনাথ ট্যোগোর্স ড্রিম মেড ভিজিবল'।

প্যারিসে রবীন্দ্র চিত্রকলা প্রদর্শনীব নিমন্ত্রণ পত্রের তারিখ ছিল ২ মে ১৯৩০। নিমন্ত্রণ পত্রে লেখা ছিল—রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি ও স্কেচ্ প্রদর্শনী।

রবীন্দ্র চিত্রকলার সমালোচনা প্রকাশিত হয় তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ফরাসী দৈনিক 'ল্য তঁ' পত্রিকায় ৭ মে ১৯৩০। সমালোচক মঁঃ অঁরি বিদু লেখার নাম দেন 'লা মাঁ দু পোয়েত'—কবির হস্ত। তিনি লেখেন, রবীন্দ্র শিল্পের মূল রেখাঙ্কন সত্যি অপূর্ব। এই লেখার ইংরেজী অনুবাদ করে ছাপা হয় বার্মিংহামে রবীন্দ্র চিত্রকলা প্রদর্শনীর ক্যাটালগে জুন ১৯৩০। কয়েকদিন পরে মার্সাই শহরের 'ল্য পেতি

মার্সাইয়েজ' দৈনিক পত্রিকায় বিস্তৃত আলোচনা করেন মঁঃ শার্ল জেনিয়ো। তাঁর লেখার শিরোনাম ছিল—'ল্যাঁদ আ পারী' অর্থাৎ প্যারিসে ভারত। ওটি প্রকাশিত হয় ২৩ মে ১৯৩০।

প্যারিসে রবীন্দ্র চিত্রকলা দেখে কাউন্টেস আন্না দ্য নোয়াই লিখেছিলেন—"বছর দশেক আগে এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় সেইন নদীর ধার দিয়ে কবির সঙ্গে বেড়াচ্ছিলাম। সামনেই ছিল সুন্দর একটি সাজান বাগান। সব মিলেয়ে প্রাচ্য-প্রাচ্য মনে হচ্ছিল। কবির দেহে ছিল লিনেনের দীর্ঘ পোষাক। সোনালী বালুকার ওপর পড়ছিল ভেলভেটের মতন ছুটো পা। তাঁর মুখে ছিলনা কোনো বিরক্তির ভাব বরং বলব সবই যেন তিনি গ্রহণ করছেন স্বচ্ছন্ধে। ভবিষ্যতের চিন্তায তিনি মগ্ন। তাঁর ছুই হাত দেখে মনে হচ্ছিল যেন শান্তির স্পর্শ। যদিও সেটা শক্তিমানেব হাত। সব মিলিযে সেদিনের বাজকীয় ভ্রমণে একটি ব্যাখ্যাই পেয়েছিলাম তাহল বাঙলা দেশেব গোলাপ বাগানেব একটি মনোবম ফুল ওই মহাপুরুষ।

"কবি রবীন্দ্রনাথ যেমন মানুষটি তেমনি তাঁর চিত্রকলা। কবির আঁকা ছবিরগুলো ঘুম ভাঙ্গার গান। স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে ওঠাব আগে তারই প্রস্তুতি পর্ব। নিঁখুত শিল্প-চাতুর্য কবি নিপুণ হাতে ফুটিয়ে তুলেছেন। শিল্পশৈলীতে রয়েছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজ কিন্তু কোথায় আতিশয্য নেই। এখানেই মনীষীর আসল পরিচয় পাওয়া যাবে।

রবীন্দ্র চিত্রকলা বুঝতে হলে চাই পবিণত বুদ্ধি। চট্ করে অনেকের মাথায় প্রবেশ সব সময় সম্ভব নয়।"

রোম্যাঁ রোলঁব সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা নিয়ে বহুবার আলোচনা হয়েছে। রবীন্দ্র চিত্রকলার অনুরাগী ছিলেন রোম্যাঁ রোলাঁ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবিতে কোন রং বেশী ব্যবহার করেছেন, কোন রং কম ব্যবহার করেছেন এবং কেন করেছেন তাই নিয়ে ভেবেছেন রোম্যাঁ রোলাঁ। সে সম্বন্ধে রোলাঁ লিখেছেন—"সেদিন রবীন্দ্রনাথ রঙের কথা বলছিলেন। লাল রঙের পছন্দ তাঁর খুবই

কম। ইতালির গ্রামাঞ্চলে লাল রঙের দৃশ্য কবিকে খুব বেশী আকৃষ্ট করে নি। বেগুনী আর নীল রঙের প্রতি প্রীতিই তাঁর বেশী। আর সবুজ রঙের প্রতি টানটা যেন একটু বেশীই।"

—রমঁ্যা রোলঁ: এঁ্যাদ, জুর্নলে' ৩ জুলাই ১৯২৬

কবির সঙ্গে রোলঁর আলোচনা হত নানা বিষয় নিয়ে। সুইৎজারল্যাণ্ডের একটি ছোট শহর ভিলনভ্-এ থাকতেন রোলঁ। সেই ভিলনভের বাড়িতে রোলঁর সঙ্গে কবির আলোচনা চলে ২৪ জুন ১৯২৬ সালের জার্মান কবি গোটেকে নিয়ে। সে আলাচনা শেষে মোড় নেয় ইউরোপীয় সংগীত, সাহিত্য ও শিল্পকলা নিয়ে। সাহিত্য আলোচনার শেষে আর্ট নিয়ে আলোচনা যখন হয় তখন রোলঁর প্রশ্নের উত্তরে কবি বলেছিলেন—"চিত্রকলা বা চারুকলায় বিষয়বস্তুই আসল এবং সেটা বুঝতে দর্শকদের খুব একটা অসুবিধা হয় না। কারণ বহু বিষয়বস্তু দর্শকের পরিচিত। কিন্তু সঙ্গীতের বেলায় তা খাটে না। বিশেষ করে বিদেশী সঙ্গীতের বেলায়। কয়েকটি শব্দ, স্বর, মূর্ছনা ছাড়া একজন বিদেশীর কাছে বিদেশী সঙ্গীত 'বিদেশী'ই থেকে যায়।"

আলোচনায় খানিক থেমে কবি আবার বলে চলেন—"যে কোনো শিল্পে কবিতায়, চিত্রকলায় বা সঙ্গীতের প্রথম কথা হল নিশ্বাস, ছন্দ হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি এবং ছন্দকে খুঁজে পাওয়া যাবে সর্বত্র। ছন্দ ছড়িয়ে আছে বিশ্বময়। আমার মনে হয় কোনো গায়ক প্রেরণা পান নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দে, আবার কারুর হয় ধমনীতে রক্তের প্রবাহে। যদি কেউ বিভিন্ন দেশের সা-রে-গা-মার প্রথম পাঁচটিকে নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেন তাহলে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যাবে। সঙ্গীতে যতই বিবর্তন হচ্ছে ততই জটিল হচ্ছে।"

১৯৩০ সালে জেনেভায় রোমঁ্যা রোলঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আবার সাক্ষাৎ হয়। সেবার অনেক বিষয় নিয়ে দুই মনীষীর মধ্যে আলোচনা হয়। ১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে দুজনের কথোপকথনে জানা যায় কবির ছবি আঁকার শখ কেমন করে হল।

রোলাঁ বললেন—'আচ্ছা কবি আপনি নাকি হঠাৎছবি আঁকতে শুরু করেন ?'

রবীন্দ্রনাথ—'হ্যাঁ, স্বীকার করছি এই ঘটনা ঘটে কোনো আগাম জানান না দিয়ে। প্রথম দিকে আমি এই ছবি আঁকার ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দিই নি। কিন্তু এখন দেখছি আপনার দেশের মানুষ আমার চিত্রকলায় বেশ গুরুত্ব দিচ্ছেন। আমি কিন্তু আগে কোনো দিন ভাবিই নি। সম্প্রতি আমার চিত্রকলা প্রদর্শনী হয়েছে প্যারিসে, বার্মিংহামে, বার্লিনে, কোপেনহেগেন ও অন্যত্র। সেখানে আমার প্রদর্শনীর কৃতকার্যতা সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না। কিন্তু সব চেয়ে যা বেশী আনন্দ দিয়েছে এবং মুগ্ধ করেছে তাহল ইউরোপের শিল্পী সাহিত্যিকরা সর্বান্তকরণে আমার ছবির প্রশংসা করেছেন। সেই প্রেরণাই আমাকে ছবি আঁকার কাজে আরও প্রবল ভাবে নিয়োজিত করেছে।'

রোলাঁ—'আমার মনে হয় আপনার অন্তরের স্বপ্ন প্রকাশের পথ খুঁজছে এবং এর কোনো কারণ নেই যা কেবল মাত্র দূরদৃষ্টিই আপনার কবিতায় ব্যক্ত হবে। ভাব প্রকাশের অন্য পথও থাকতে পারে।'

রবীন্দ্রনাথ—'বাক্যের পরিধি সীমাবদ্ধ কিন্তু রেখার নয়। চিন্তার রয়েছে রূপ ও গড়ন এবং তার সঙ্গে রং মেশালে হয়ে যায় চিত্র। এটা ঠিকই যে, যখন আমি ছবি আঁকি তখন আমার মধ্যে সৃষ্টির আনন্দ খুঁজে পাই। যা অন্য কিছুর থেকে স্বতন্ত্র। যা শুধু আমি পাই কবিতা রচনায় বা সঙ্গীতের সুরে।

রোলাঁ—'জার্মান কবি হারমান্ হেস্‌সে প্রায় চল্লিশ বছর কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে তুলি ধরেছেন। আপনার সঙ্গে ওঁর অনেক মিল দেখছি। আমি খুব আনন্দিত হয়েছি যে আপনি তুলি দিয়ে (প্রধানত আপনি কলম দিয়ে আঁকছেন) আপনার চিন্তা এবং স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করে চলেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আপনি সঙ্গীত রচনা ও তার সুর দানের কাজও করে চলুন,—যদি সম্ভব হয় তাহলে

ইউরোপীয় সঙ্গীতের স্বরলিপির মতন স্বরলিপিও লিখে যান। বেশী কি বলব ছবির মতন গানও তো সর্বজনীন আন্তর্জাতিক।'

রবীন্দ্রনাথ—'এখন আমার কাছে ছবি আঁকা এক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আমার জীবন-প্রভাতের সঙ্গী ছিল কাব্য আর সঙ্গীত আর এখন এই জীবন-সন্ধ্যায় আমার একমাত্র সঙ্গী হচ্ছে রেখা গড়ন রং। আমার গান আর কবিতা আমার মাতৃভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমার দেশকে দিয়েছি ওগুলো আর বিদেশে পাশ্চাত্ত্যকে দিয়েছি আমার চিত্রকলা।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রোমঁ্যা রোলঁ ; চিঠিপত্র ও অন্যান্য রচনা ; প্যারিস, ১৯৬১, পৃঃ ১৮৬, ১৯৭—১৯৮

জার্মানীতে

রবীন্দ্র চিত্রকলা প্রদর্শনী প্রথমে হয় প্যারিসে ১৯৩০ সালের মে মাসে। তারপর হয় ওই বছরের জুন মাসে লণ্ডনে ও বার্মিংহামে। ইংরেজদের দেশে কবির চিত্র প্রদর্শনীর চেয়ে অনেক অনেক বেশী সম্বর্ধনা ও কৌতূহল দেখা যায় জার্মানীতে। তারপর দেখা যায় রাশিয়ায়। রাশিয়ায় প্রদর্শনী হয় আগস্ট মাসে। তার আগে হয় জার্মানীতে জুলাই মাসে। জার্মানীতে কেমন ভাবে প্রদর্শনী হল এবং কেমন সম্বর্ধনা বা প্রশংসা পেয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যাবে কবির লেখা কয়েকটা চিঠিতে। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলুম। আছি দাক্ষিণ ফ্রান্সে—আকাশে আলোকের কার্পণ্য নেই, ধরাতলে আছে পুষ্পপল্লবের দাক্ষিণ্য। ভালোই আছি, সামনেই যদি কোনো দায়িত্ব না থাকত আরো ভালো থাকতুম; নববসন্তের ইঙ্গিত অস্বীকার ক'রে বক্তৃতা লিখতে হচ্ছে। সময়ের একটু ফাঁক পেলে ছবিও আঁকি, তবু সেটার সঙ্গে কিশলয় উদগমের সুরের মিল আছে। এখানে একজন জার্মান সস্ত্রীক আছেন— ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসের। আমার ছবিগুলো দেখে অত্যন্ত উত্তেজিত— বলেন, বার্লিনে এগুলো দেখানো চাই-ই—absolutely! আশা হচ্ছে এগুলো রসিকের দৃষ্টিগোচর হবে। পণ করেছি 'আমার জন্মভূমি'তে ফিরিয়ে নিয়ে যাব না—অযোগ্য অভাজনদের স্থূল হস্তাবলেপ অসহ্য হয়ে এসেছে। রোটেনস্টাইনকে যে চিঠি লিখেচ আশা করি ব্যর্থ

হবেনা। দেখা হলে আমিও দু-চার কথা বলব। কিন্তু ওর শক্তিতে কুলোবে কি না নিশ্চিত জানিনে। যখন অক্সফোর্ডে যাব তখন একবার চারদিক হাৎড়ে দেখা যাবে। কন্টিনেন্টে যদি কোনো সুযোগের সন্ধান পাই ভুলবনা। আমার জার্মান বন্ধুর সঙ্গে আজ একবার কথা কয়ে দেখব। আশা করি আমার এ চিঠি তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছবে। না যদি পৌঁছয় তবে অন্য যে ব্যক্তির হাতে প'ড়বে তার প্রতি আমার বক্তব্য এই যে ব্রিটিশ সাম্রাজের তলা ফুটো করার সঙ্কল্প যদি আমার মনে থাকে তবে চিঠিতে তা প্রকাশ পাবে এত বড়ো আহাম্মক আমি নই। ইতি ১ এপ্রিল ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুব

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা আরেকখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জার্মানীতে প্রদর্শিত তাঁর চিত্রকলা সম্বন্ধে লিখেছেন—

···আমার দিনগুলো মোটের উপব ভালোই চ'লচে। পশ্চিম মহাদেশে আমার ভাগ্যচক্র যশের পথে চলতে বাধা পায় না। স্বদেশে তা'র ডিরেল্‌মেণ্ট্‌ পদে পদে। জার্মানিতেও ছবিব আদর কম হয নি। বলচে এগুলো অত্যন্ত আধুনিক। তা'র মানে মোগল দরবার থেকে অনেক দূরে—মক্কা-মদিনা পেরিয়ে এসেচে। সঙ্গে যদি থাকতে পারতে খুসি হ'তে কারণ আমার খ্যাতি তোমাকে পীড়ন করে না তোমার সেই ঔদার্য আছে। আমাব যশোভাগ্য আমেরিকা পর্যন্ত আমার অনুবর্তন করবে কিনা জানিনে—তা'র পরিবর্তে যদি ধনভাগ্য মেলে তাহলে নালিশ করব না। ইতি ২৮ জুলাই ১৯৩০

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদেশীকে আপন করার ক্ষমতা ছিল রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম। বিদেশীদের মনের অন্তরে তিনি প্রবেশ করতে পারতেন। আর পশ্চিমের মনীষী চিন্তাশীলরা সম্পূর্ণ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন রবীন্দ্র মনীষাকে।

ফ্রান্সের সঙ্গে যেমন রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ তেমনি ছিল জার্মানীর সঙ্গেও। জার্মানীর চিন্তাশীল মহল যেমনভাবে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেছিল সে সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় পশ্চিম জার্মান দূতাবাস কর্তৃক প্রকাশিত 'আজকের জার্মানী' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা ফেব্রুয়ারী ১৯৭২-এ। ওই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের জার্মানী ভ্রমণ, চিন্তাশীল মহলের সঙ্গে যোগাযোগ ও তাঁর চিত্রকলা প্রদর্শনী সম্বন্ধে যে সব তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে তা রবীন্দ্রানুরাগী মাত্রেই শ্রদ্ধাব সঙ্গে গৃহীত হবে।

"১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথের সেই প্রথম জামানী সফরের পরে আরও দুবার তিনি জার্মানীতে যান—১৯২৬ ও ১৯৩০ সালে। প্রতিবারই তিনি সেখানে অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা ও সমাদর লাভ করেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে রবীন্দ্রনাথের জার্মানী সফব, তাঁর অভ্যর্থনা এবং সমাদরের একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়।

তরুণ বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ জার্মানীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হন। এক সময়ে তিনি গভীর আগ্রহেব সঙ্গে জার্মান ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেন। ১৮৯০ সালে ৩ জুন শিলাইদহ থেকে প্রমথ চৌধুরীকে লিখছেন, 'জার্মান ফাউস্ত অল্প অল্প করে পড়তে চেষ্টা করছি। তুমি থাকলে তোমাকে আমার সহপাঠী করা যেত। এ রকম পড়া দুজনে মিলে লাগলেই তবে এগোয়। পড়ার মাঝে মাঝে মৌলবীর বক্তৃতা নায়েবের কৈফিয়ৎ প্রজাদের দরখাস্ত এসে পড়লে জার্মান ভাষা বুঝে ওঠা কি রকম ব্যাপার হয় তা তুমি সহজেই অনুমান করতে পারবে।'

'রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে ইউরোপীয় ভাষা চর্চার কথা বললেও জার্মান ভাষা চর্চার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তিনি রেখে গিয়েছেন তাঁর অনুবাদ কর্মে। ১২৯৯ সালের বৈশাখে, তিনি হাইন্‌রিষ হাইনের কিছু কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেন, এই অনুবাদগুলো নানা দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। হাইনের গীতি কবিতার নিটোল রূপটি তিনি যথাযথ

ধরেছেন। অনুবাদগুলো পড়লে মনেই হয় না যে, এগুলো অনুবাদ, যেন নিজস্ব রচনা। অথচ সবচেয়ে আশ্চর্যের এই যে, কবিতাগুলো সম্পূর্ণরূপে মূলানুসারী, জার্মান প্রতিটি শব্দের ব্যঞ্জনাও যথাযথভাবে বাংলায় প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন—

প্রথম আশাহত হয়েছিনু
ভেবেছিনু সবে না বেদনা!
তবু তো কোন মতে সয়েছিনু.
কি ক'রে যে সে কথা শুধাও না!

"বোধহয় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ জার্মানী ভ্রমণের জন্য আগ্রহান্বিত হন। শান্তিনিকেতন থেকে ১৯১৪ সালের ১০ মার্চ প্রমথ চৌধুরীকে লিখছেন, 'একটা খবর পেলুম বার্লিনে আমি যাচ্চি—আমার বক্তৃতার জন্যে একটা প্রকাণ্ড হল ঠিক্ হয়ে গেছে। সেখানকার একজন মেয়ে এই উপলক্ষ্যে আমাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছে। এ সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে তোমরা কিছু জান কি?' (চিঠিপত্র, ৫ খণ্ড, পত্রসংখ্যা ২০ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু নানা কারণে ১৯২১ সালের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ জার্মানীতে যেতে পারেননি।

"১৯২০ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ পুনর্বায় ইউরোপ যাত্রা করেন। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ ঘুরে তিনি ১৯২১ সালের মে মাসে জার্মানীতে যান। তাঁর জার্মানী সফরের সংবাদ অনেক আগেই সেদেশে প্রচারিত হয়েছিল। জনগণের ঔৎসুক্যও ছিল অপরিসীম। ভারতীয় সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জনগণকে অবহিতকরতে জার্মান সুধীসমাজ সচেষ্ট হন। বিভিন্ন সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯২১ সালের ৩০ জানুয়ারী ন্যুরেমবার্গের পৌর-নাট্যশালায় অনুষ্ঠিত এই রকম একটি সভাতে বক্তা ডঃ হান্স ফিডলার ভারতের অতীত গৌরব, ভারতীয় মানসিকতা ও বিশ্বসভ্যতায় ভারতের অবদানের কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে অনেক কথা বলেন।

"কবির জার্মানী সফর এবং তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে জার্মানীর বিশিষ্ট

কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও পুস্তক প্রকাশকরা সম্মিলিত হয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। স্টুটগার্ট থেকে ৬ মে, ১৯২১ সালে তাঁরা কবির উদ্দেশে একটি দীর্ঘ প্রশস্তি পত্র পাঠান এবং সেই সঙ্গে জার্মান সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনের এক বিরাট পুস্তক সংগ্রহও। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দীনবন্ধু এ্যাণ্ড্রুজকে ১০ মে জুরিখ-এর উপকণ্ঠ থেকে লিখছেন,— 'I have just received a birthday greeting from Germany through a committee consisting of men like Eucken, Harnack, Hauptmann, and others and with it a most generous gift consisting of at least 400 copies of valuable German books. It has deeply touched my heart, and I feel certain that it will find response in the hearts of my countrymen.'

"ডার্মস্টাড্ট শহরে ফিংগস্টেন-এ কবি কাউন্ট হেবমান কাইজারলিং এর অতিথি হয়ে একদিন কাটান। তারপর হামবুর্গের দিকে যাত্রা করেন। কাউন্ট কাইজারলিং ১৯১১ সালে যখন ভারতে আসেন তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁর ভ্রমণকথায় তিনি রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা ও ঠাকুরবাড়ির কথা লিপিবদ্ধ করেন। ২২ মে, ১৯২১ সালে তিনি 'ডের টাগ' পত্রিকাতে 'রবীন্দ্রনাথ ও জার্মানী' এই নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

"কবি সাতদিন (১৩ মে-২০ মে, ১৯২১) হামবুর্গে ছিলেন। শেষ দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতা হয়। জার্মানীতে এই তাঁর প্রথম ভাষণ। এই বক্তৃতায় মহাকবি গ্যয়টে প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, তাঁর (গ্যয়টের) মধ্যেই মানুষ ও প্রকৃতি একাত্ম হতে পেরেছে। জাতিতে জাতিতে মিলনের বাণীবহ এই বক্তৃতাকে সংবাদদাতারা 'অবিস্মরণীয় বক্তৃতা' বলে বর্ণনা করেছেন।

"কবি এরপর ২১ ও ২৪ মে যথাক্রমে কোপেনহেগেন ও স্টকহলম-এ বক্তৃতা করেন, সেখানেও বিপুল সম্বর্ধনা লাভ ক'রে ২৯ মে ১৯২১ সালে বার্লিনে আসেন। ২ জুন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন।

কবি সম্বর্ধনার ইতিহাসে Unter den Linden-এর ঐ প্রশস্ত রাজপথে জার্মান জাতি যেন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ৩১ মে একটি পত্রদ্বারা রবীন্দ্রনাথকে বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

"এই ভ্রমণ প্রসঙ্গে বার্লিনের 'ডয়েচে আলগামামাইনে ৎসাইটুং' ৩০ মে, ১৯২১ সালে কবির সঙ্গে তাঁদের পত্রিকার এক বন্ধুর সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশ করেন।

"বার্লিন থেকে কবি ৫ জুন জার্মানীর অন্যতম সংস্কৃতি কেন্দ্র মিউনিখে আসেন। এখান থেকেই কুর্ট ভোল্‌ফ রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গ্রন্থের জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন। বইগুলি অসাধারণ জনপ্রিয়তাও লাভ করে। এই কুর্ট ভোলফের আমন্ত্রণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন।

"রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলি প্রকাশ করে কুর্ট ভোলফ প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। কবির দ্বিতীয়বার জার্মানী ভ্রমণের সময় তিনি 'ছিন্নপত্রের' কিছু অংশ 'গ্রাম বাংলার চিত্র' এই নামে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের অনুমতি দেন। অন্যান্য বহু লেখকের মত রবীন্দ্র-নাথের বইগুলোর বহুল প্রচারের মূলে তাঁর দান অনস্বীকার্য। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, বিশ ও তিরিশ দশকে জার্মান পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে কুর্ট ভোলফ একটি অবিস্মরণীয় নাম।

"মিউনিখের দৈনিক পত্র 'ম্যুনখেনের ৎসাটুং' ৮ জুন 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' এই শিরোনামায় একটি সংবাদ পরিবেশন করেন—

'প্রসিদ্ধ ভারতীয় কবি ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে।…এ যেন একটি কৃতিত্ব—নির্যাতিতের বন্ধুর কৃতিত্ব। আর আমরা জার্মানরা তো আজ নির্যাতিত।…' এখানেও তাঁর বক্তৃতার বিষয় 'অরণ্যের বাণী'। এখানেও সেই একই চিত্র—বিশাল বক্তৃতা কক্ষের শেষ আসনটি পর্যন্ত পূর্ণ। তাঁর দীর্ঘ, সুঠাম দেহ, তাঁর বাচনভঙ্গী, তার পদক্ষেপ, সর্বোপরি তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের বাংলা, ইংরেজী

ও সংস্কৃত পাঠ শ্রোতৃবর্গের বিস্ময় উদ্রেক করেছিল। তাঁরা বার বার কবির কণ্ঠে আবৃত্তি ও কবিতা পাঠ শুনতে চেয়েছেন।

"পরিশেষে সংবাদদাতা লিখছেন, 'রবীন্দ্রনাথের বাণী শান্তির বাণী প্রেমের বাণী। ··নিপীড়িত জার্মানীর প্রতি বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ তিনি আমাদের ক্ষুধার্ত শিশুদের জন্য দশ সহস্র মার্ক দান করেছেন। উন্মত্ত করতালি দিযে শ্রোতৃবর্গ দান গ্রহণ করেছেন।'

"এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, কবিব দানের পরিমাণ অনেক বেশি (প্রায় ২৬ হাজার মার্ক)। কবি তাঁব একখানি বই-এব বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ যুদ্ধক্লিষ্ট জার্মান শিশুদেব জন্য দান কবেন। বইটির জার্মান নাম: "ফ্লাস্টার্ন ডের সেলে" (Whisperings of the Soul)— কিন্তু ঐ নামে কোনও ইংবেজী রচনা প্রকাশিত হয়নি। কবি বিভিন্ন সময়ে শান্তিনিকেতনে ছাত্রদেব উদ্দেশে যে ভাষণ দেন এটি তাবই এক সংগ্রহেব অনুবাদ।

"রবীন্দ্রনাথের এই দানেব কথা স্বীকাব করে ৮ ফেব্রুয়াবী, ১৯২২-এ মিউনিখের লর্ড মেযব কবিকে একটি পত্র দেন (পত্র সংখ্যা 368 VIII 22 296)। লর্ড মেয়ব লেখেন: 'মহানুভবের অভাব সহৃদয়তা যে, আপনি কুট ভোলফ সংস্থাব মাধ্যমে আপনাব বই ফ্লাস্টার্ন ডেব সেলে-র বিক্রয়লব্ধ অর্থের অর্ধেক আমাদের পাঠিয়েছেন। উপরিউক্ত সংস্থা আমাদের ১৩০২৭-৯৫ মার্ক পাঠিয়েছেন। আমরা এই অর্থ দৈন্যপীড়িত শিশুদের ভরণপোষণে এবং তাদের শুশ্রূষাগৃহে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় করব।' রবীন্দ্রনাথের এই দানের জন্য তিনি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে সমগ্র জাতির হয়ে কবিকে ধন্যবাদ জানান।

"তারপর কবি ডামস্টাড্‌ট শহরে আসেন হেসে-র প্রাক্তন গ্র্যাণ্ড ডিউক-এব আমন্ত্রণে।

"এই ডার্মস্টাড্‌ট শহবে কবি ৯-১৪ জুন অতিবাহিত করেন। অনুপম মাধুর্যে ভরা এই দিনগুলোর কথা 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে রথীন্দ্রনাথ উল্লেখ কবেছেন। তাঁর বর্ণনা পড়তে পড়তে অভিভূত হয়ে যেতে হয়।

তিনি লিখছেন—'বাবা জার্মানীতে যে ধরনের অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন তার তুলনা হয় না, আমাদেব সবচেয়ে ভাল লেগেছিল ডার্মস্টাটে আমবা যে-একটা সপ্তাহ ছিলাম। ডার্মস্টাটে আমরা ছিলাম হেস্‌সের গ্র্যাণ্ড ডিউকের অতিথি হয়ে।…"

"ডার্মস্টাটে আমাদের সপ্তাহব্যাপী অবস্থানকালে বাবার কোনো ধরাবাঁধা দৈনন্দিন কার্যসূচি ছিল না। না ছিল সংবর্ধনা, সভা-সমিতি। সে-কয়দিন প্রাসাদের বাগান খুলে দেওয়া হয়েছিল সর্বসাধারণের জন্য, সকালে কিংবা বিকালে, যখনই বেশ কিছু লোক জমায়েত হত, বাবা বাগানে নেমে এসে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা কবতেন। ডার্মস্টাটে বাবার জন্য যাবতীয ব্যবস্থাব ভার নিয়েছিলেন কাউণ্ট হের্‌মান কাইজারলিং।'

পিতৃস্মৃতি, পৃঃ ১৯৪—১৯৬

"প্রায় পাঁচ বছর পবে রবীন্দ্রনাথ আবাব জার্মানীতে আসেন। ১৯২৬ সালেব ১২ মে কবি আবাব ইউবোপ যাত্রা করেন। ইতালি ও অন্যান্য দেশ সফব কবে ৮ সেপ্টেম্বর কোপেনহেগেন থেকে যাত্রা করে পবদিন ৯ সেপ্টেম্বর হামবুর্গে পৌছান। নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ক-এ কবি যে সম্বর্ধনা ও সমাদব লাভ করেন তাতে তাঁর মন অনেক তৃপ্ত হয। যখন জার্মানীব পথে পা বাড়ালেন তখন তাঁর মন যে কত আনন্দাকুল হয়ে উঠেছিল তাব পাবিচয় পাওয়া যায় কবির তৎকালীন গীতধারায়।

"জার্মানীতে পদার্পণের প্রথম দিনই বিকালে (৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬) হামবুর্গে কবি-সম্বর্ধনাব বিশাল আয়োজন হয়। পরদিন কবি কনভেণ্ট গার্ডেনে বক্তৃতা করেন। বিষয়—'সভ্যতা ও প্রগতি'। সহস্রাধিক লোক শ্রোতা। এই প্রসঙ্গে হামবুর্গ-এর দৈনিক পত্রিকা 'হামবুর্গাব একো' ১২ সেপ্টেম্বর 'ববীন্দ্র সন্ধ্যা' এই শিবোনামায বিস্তারিত সংবাদ পরিবেশন করেন।

"হামবুর্গে কবি দুটি গান রচনা কবেন: 'কাব চোখেব চাওয়ায় হাওয়ায় দোলায় মন।' (৯।৯।১৯২৬) 'রয় যে কাঙাল শূন্য হাতে দিনের শেষে।' (১০।৯।১৯২৬)

"১১ সেপ্টেম্বর বিকালে কবি বার্লিনে আসেন। বিদেশীকে অভ্যর্থনা জানাতে বার্লিনবাসীরা কোনদিনও কার্পণ্য করেনি। তার ওপর আসছেন তাঁদেরই প্রিয় কবি যাঁর প্রথম সফরের স্মৃতি তখনও জনমানসে অম্লান। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য স্টেশন লোকে লোকারণ্য।

"১৩ সেপ্টেম্বর কবি বার্লিন ফিল্‌হার্মানীক-এ বক্তৃতা করেন। বার্লিনার ফোকস ৎসাইটুং ১৪ সেপ্টেম্বর সংবাদ পরিবেশন করেন: 'কবির বক্তৃতা শোনার জন্য জনসমাগমের আর যেন শেষ নেই। ফিল্‌হারমনীকের বিশাল হলে প্রবেশপত্র না পেয়ে শত শত লোক ফিরে আসছেন। শুধু যে জার্মানরা সমবেত হয়েছেন তা নয়, এবার শ্রোতৃবর্গের মধ্যে আছেন ফরাসী, ইংরেজ, রুশ, জার্মান। মাঝে মাঝে ভারতীয় কথার দু' একটি টুক্‌রো ভেসে আসছে। ফিল্‌হারমোনীকের বিশাল হলে তিল ধারণের স্থান নেই।

"পরদিন ১৪ সেপ্টেম্বর অতিবাহিত হয় বিভিন্ন নিমন্ত্রণ রক্ষায়। কবির সম্মাননায় সেদিন সকালে সাংস্কৃতিক মন্ত্রী শ্রীবেকার কয়েকজন বিশিষ্ট জার্মান পণ্ডিতকে তাঁর দপ্তরে নিমন্ত্রণ জানান। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন: আলবার্ট আইনস্টাইন, ভারনার ইয়াগার এরিখ মার্কস, ফ্রিডরিখ মাইনেকে, জাতীয় সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ শ্রাডার (কিল) এবং প্রিভি কাউন্সিলর ইউস্টি ও ভাটৎসোল্ডট।

"সেদিন দুপুরে অধ্যাপক আইনস্টাইন তাঁকে চা-চক্রে আপ্যায়িত করেন। সন্ধ্যায় কবি সম্মাননায় ভারতীয়দের সংস্থা হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশন কবির বাসস্থান কাইসারহফ হোটেলে এক চা-চক্রের আয়োজন করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাইখ রাষ্ট্রপতি ল্যোবে, সাংস্কৃতিক মন্ত্রী বেকার, প্রখ্যাত মহিলা চিত্রশিল্পী কাথে কোলভিৎজ এবং অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি (ফোসিশে ৎসাইটুং, বার্লিন, ১৫।৯।১৯২৬)।

"কলিকাতার সংবাদপত্র 'দি বেঙ্গলী' ১৭ সেপ্টেম্বর এক সংবাদ

পরিবেশন করেন। তাঁদের সংবাদদাতা ১৫ সেপ্টেম্বর বার্লিন থেকে জানান—

President Hindenburg received Rabindranath Tagore, who is touring Germany. President Hindenburg promised to exert his influences for the purpose of arranging exchange of Indian and German professors for the Visva-Bharati University.

"বার্লিন সফরকালে ডঃ হেরমান বুডজিস্লাভস্কি একদিন কবির সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনা করেন। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৬-এ বার্লিনের 'ব্যোরসেন ৎসাইটুং' এ বিষয়ে এক অতি মনোজ্ঞ বিবরণ প্রকাশ করেন। এই বিবরণ পাঠে দেখা যায় যে, কবি স্পষ্ট ভাষণে কোনও দিন দ্বিধা করেন নি। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার দোষ-গুণ উভয় দিক নিয়েই তিনি আলোচনা করেন।"

বার্লিনেব পর কবি ১৫ সেপ্টেম্বর মিউনিখের পথে যাত্রা করেন। ১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর সেখানে ছুটি গান রচনা করেন।

'ছুটিব বাঁশি বাজ্‌ল যে ঐ নীল গগনে।'—১৭ সেপ্টেম্বর

'নাই, নাই ভয়, হবে, হবে জয়,
খুলে যাবে এই দ্বার।' —১৮ সেপ্টেম্বর

মিউনিখেব বক্তৃতা শেষ করে কবি ১৮ সেপ্টেম্বর ন্যুরেমবার্গে আসেন, এখানেও কবি বক্তৃতা ও কবিতা পাঠ করেন। সর্বত্রই জনসাধারণের সমান উৎসাহ-উদ্দীপনা। সভাগৃহ জনপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রখ্যাত জার্মান শিল্পী আলব্রেখট ড্যুরার-এর বাড়িটি পরিদর্শন করেন। সেখানে লেখেন—

'আমার মুক্তি গানের সুরে
এই আকাশে' —১৯ সেপ্টেম্বর

'সকাল বেলার আলোয় বাজে।' —২০ সেপ্টেম্বর

১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ন্যুরেমবার্গে অতিবাহিত করে কবি পরদিন

সন্ধ্যায় স্টুটগার্ট যাত্রা করেন। সেইদিনই (২০ সেপ্টেম্বর) অধিক রাত্রে তিনি পৌঁছে যান। ২১ সেপ্টেম্বর সেখানে তাঁর বক্তৃতা হয়। এখানে লিখলেন—

'মধুর তোমার শেষ যে না পাই।' —২১ সেপ্টেম্বর

তখন তার পাঠ ছিল—'ভালো লাগার শেষ যে নাই।'

২২ সেপ্টেম্বর কবি ট্রেনে স্টুটগার্ট থেকে ফ্রাঙ্কফুর্টে আসেন। তারপর মোটরে ভিসবাডেনে যাবার পথে ফ্রাঙ্কফুর্টে মহাকবি গ্যয়টের জন্মস্থান পরিদর্শন করেন। ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কবি ভিসবাডেনে থাকেন।

২৪ সেপ্টেম্বর স্টীমারে রাইনের উভয় তীরের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে কোলন-এর পথে অগ্রসর হলেন। সেদিন সন্ধ্যায় কবির বক্তৃতা করার কথা কোলন-এ। পাছে পৌঁছতে দেরি হয় সেজন্য বন-এ নেমে বাকি পথ মোটরে যান।

কোলন থেকে ড্যুসেলডর্ফ হয়ে কবি ২৬ সেপ্টেম্বর আবাব বার্লিনে আসেন। সেদিন সন্ধ্যায় কবি বিথোফেন হলে কবিতা পাঠ করেন। শ্রোতাদেব আনন্দ অভ্যর্থনাব শেষ ছিল না।

বার্লিনে একদিন কাটিয়ে কবি লিপৎজিগ-এ বওনা হন। সেখান থেকে ব্রেসলাউ হয়ে জার্মানীর পূর্বদিকেব একেবারে শেষ শহর বেনথেন-এ আসেন। সর্বত্রই কবিব আগমনে জনচিত্ত আনন্দ-উদ্বেল। সীমান্ত পার হয়েও বহু লোক কবিব বক্তৃতা শুনতে আসেন। ড্রেসডেন-এর ইউনিয়ন হোটেল থেকে ৪ অক্টোবর ১৯২৬ সালে শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশ লিখছেন: "বয়টনেব লোকেরা কবিকে পেয়ে যে কী করছে, কী বলব। স্টেশনে লর্ড মেয়র এসে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। সমস্ত শহরের লোক যেন ভেতবে আর বাইবে ভেঙে পড়ল। রাস্তা নিশান দিয়ে সাজানো, হোটেলে নিশান উড়িয়েছে, যেন সারা শহর কোনো রাজাকে অভ্যর্থনা করছে। সমস্ত দিনরাত হোটেলের সামনের রাস্তায় গিশ্ গিশ্ করছে লোকের ভিড়,—কোনো মেলা বসেছে যেন। এর

উদ্দেশ্য, কবি যখন কোথাও যাবার জন্য বেরোবেন, তখন একবার তাঁকে চোখের দেখা দেখতে পাওয়া।"

—'কবির সঙ্গে ইউরোপে', পৃঃ ১৯৩-১৯৪

তারপর ২ অক্টোবর কবি ড্রেসডেন-এ আসেন। প্রবাসীর সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা শোনার জন্য বার্লিন থেকে ড্রেসডেন-এ আসেন। তিনি লিখছেন: "সন্ধ্যার সময় বক্তৃতার কিছু পূর্বে আমরা একটি প্রকাণ্ড হলে গেলাম। দেখিলাম, হলে একটুও জায়গা খালি নাই, কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া আছে।…। বক্তৃতার পর কবি তাঁহার কয়েকটি ইংরেজী ও বাংলা কবিতা আবৃত্তি করিলেন। এগুলি বিশেষতঃ "দি ক্রেসেণ্ট মুনের" কবিতাগুলি, শ্রোতাদের এত ভাল লাগিয়াছিল যে, কবি যত কবিতা আবৃত্তি করিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী আবৃত্তি তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল।"

—'সম্পাদকের চিঠি,' প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩৪

কবি ৫ অক্টোবব বার্লিনে ফিরে পরদিন উত্তরে সমুদ্রোপকূলের শহর, রস্টক-এ বক্তৃতা করেন।

কবি কোলন শহরে লেখেন:

'চাহিয়া দেখ রসের স্রোতে'। —২৪ সেপ্টেম্বর

'তুমি উষার সোনার বিন্দু'। —২৪ সেপ্টেম্বর

ডুসেলডর্ফে লেখেন:

'আপন গানের টানে,' —২৫ সেপ্টেম্বর

পাঠান্তর: 'গানে গানে তব বন্ধন যাক টুটে'।

'বার্লিনে লেখেন: 'আপ্‌নি আমার কোন্‌খানে,' —৬ অক্টোবর

১৯২৬ সালের জার্মানী সফরে কবি উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিম একের পর এক শহরে বক্তৃতা করে বেড়িয়েছেন। কী অপরিসীম কষ্ট স্বীকাব করেছেন তা তাঁর সফরসূচী দেখলেই বোঝা যাবে।

এই সফর প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথ 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে লিখছেন: "১৯২৬ সালে বাবার এই ইউরোপ-সফর নানা কারণে স্মরণীয়। যাঁরা এই

সফরে বাবার সঙ্গে ছিলেন না তাঁদের ধারণা করা শক্ত, কী হৃদ্যতার সঙ্গে সর্বত্র বাবা সংবর্ধিত হয়েছিলন। দেশের নেতৃস্থানীয় লোক থেকে শুরু করে আপামর সাধারণ সবাই তাঁকে প্রভূত সমাদরে বরণ করে নিয়েছিল। কেবল কবি বা মনীষী বলে নয়, দ্রষ্টা সাধকরূপেও তিনি গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন সমস্ত লোকের।"

—'পিতৃস্মৃতি' পৃঃ ২১০

১৯২৬ সালের পর ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ আবার ইউরোপ যাত্রা করেন। এবারে কবি সঙ্গে নিয়ে যান তাঁর সৃষ্টির নতুন ফসল, তাঁর চিত্রসম্ভার।

মে মাসের প্রথম দিকে প্যারিসে তাঁর চিত্র প্রদর্শনীব ব্যবস্থা হয়। চিত্রকর হিসেবেও কবি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। এই খ্যাতির সংবাদ জার্মানীতেও ছড়িয়ে পড়ে। কবির ছবি দেখার জন্য জার্মানীতেও যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি হয়।

মে মাসের মাঝামাঝি কবি ইংলণ্ডে যান। অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতা দেবার জন্য তিনি বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হন। এই বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল মানুষের ধর্ম। জুন মাসের প্রথম দিকে বার্মিংহাম শহরে কবির চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়।

ইংলণ্ড থেকে ১১ জুলাই কবি শ্রীআরিয়াম ও শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে বার্লিনে পৌছান।

১২ জুলাই রাইখস্টাগ (পার্লামেণ্ট)-এ গিয়ে সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাইখ প্রেসিডেন্ট ল্যোবে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। সেইদিনই অপরাহ্নে তিনি ম্যোলার চিত্রশালা দেখতে যান। এইখানেই কবিব চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। কবির পত্রাবলী থেকে জানা যায় যে, ডঃ সেলিগ নামে জনৈকা জার্মান মহিলা কবির চিত্র প্রদর্শনীর সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন।

—'চিঠিপত্র,' ২য় খণ্ড, পত্র সংখ্যা ৩৬

১৩ জুলাই ম্যোলার চিত্রশালায় কবির চিত্র প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন

করা হয়। এতদিন জার্মানী রবীন্দ্রনাথকে কবি, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিক হিসেবে জেনেছেন। কিন্তু জীবন সায়াহ্নে কবি তাঁর যে নতুন ফসল তাঁদের সামনে মেলে দিলেন তার সম্যক পরিচয় লাভের জন্য তাঁরাও খুব ব্যগ্র হলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী নির্মল-কুমারী মহলানবিশকে লিখছেন—, "এ পত্র পাবার অনেক আগেই জানতে পেরেছ যে, জার্মানীতে আমার ছবির আদর যথেষ্ট হয়েছে। বার্লিন ন্যাশনাল গ্যালারি থেকে আমার পাঁচখানা ছবি নিয়েছে।··· কবিতা যখন লিখি তখন বাংলার বাণীর সঙ্গে তার ভাবের যোগ আপনি জেগে ওঠে। ছবি যখন আঁকি তখন রেখা বলো রঙ বলো কোনো প্রদেশের পরিচয় নিয়ে আসে না। অতএব এ জিনিসটা যারা পছন্দ করে তাদেরই, আমি বাঙালি বলে এটা আপন হ'তেই বাঙালির জিনিস নয়। এইজন্য স্বতঃই এই ছবিগুলিকে আমি পশ্চিমের হাতে দান করেছি। ···আমি যে শতকরা একশো হারে বাঙালি নই, আমি যে সমান পরিমাণে য়ুরোপেরও এই কথাটারই প্রমাণ হোক আমার ছবি দিয়ে।" ('পথে ও পথের প্রান্তে'। পত্র সংখ্যা ৪৯, আগস্ট, ১৯৩০)। রবীন্দ্র সদনে রক্ষিত অপ্রকাশিত পত্রাদি থেকে জানা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ঐ পাঁচখানি ছবি ন্যাশনাল গ্যালারিতে দান করেন।

১৪ জুলাই অধ্যাপক আইনস্টাইনের সঙ্গে কবির আবার সাক্ষাৎ হয়। এই দিনই কবি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন। আগের বারের মত এবারেও রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শোনার জন্য জনসমাগমের শেষ নেই। এবারেব বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল শিল্পকলার ধর্ম। প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক লিউয়েডার্স সংস্কৃত, ইংরেজী ও জার্মান ভাষায় কবিকে অভ্যর্থনা জানান।

১৫ জুলাই বার্লিনের হিন্দুস্থান হাউসে প্রবাসী ভারতীয়রা এক চা-চক্রে কবিকে সম্বর্ধনা জানান। বহু বিশিষ্ট জার্মান এই সভাতে উপস্থিত ছিলেন। কবি নিজের কবিতা পাঠ করে শোনান।

বার্লিন থেকে হুমবোল্ড্‌ট ক্লাবের আমন্ত্রণে কবি গেলেন ড্রেসডেন-এ।

এই ক্লাবে বহু প্রথিতযশা ব্যক্তি পূর্বে বক্তৃতা করেছেন। ক্লাবের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ডঃ ফেলিক্স হোলডক কবিকে অভ্যর্থনা জানান। ড্রেসডেন-এও (১৭—১৯ জুলাই) কবিকে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে হয়।

ড্রেসডেন থেকে কবির পরবর্তী গন্তব্যস্থল ছিল মিউনিখ। এখানে তিনি ১৯-২৪ জুলাই পর্যন্ত অবস্থান করেন। মিউনিখে পৌঁছেই কবি পরদিন (রবিবার) বিখ্যাত 'প্যাসান প্লে' দেখবার জন্য ওবারামারগাউ-এ যান। প্রতি দশ বছর অন্তর এখানে যীশুখৃষ্টের শেষ জীবন নিয়ে যে অভিনয় হয়, কবি সমস্ত দিন ধরে তা প্রত্যক্ষ করেন। মনে হয় এই ঘটনারই প্রভাবে কবি "The Child" কবিতাটি লেখেন।

২১ জুলাই রবীন্দ্রনাথ মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন। বিষয়বস্তু শিল্পকলার ধর্ম।

২০ জুলাই আউগসবুর্গ থেকে প্রকাশিত 'আউগসবুর্গার পোস্ট ৎসাইটুং' থেকে জানা যায় যে, ২২ জুলাই ডয়েচে অ্যাকাডেমি, স্টুডেন্টেন হাউস-এ কবি সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। ঐ সঙ্গে 'ডাকঘরের' অভিনয়েরও ব্যবস্থা করা হয়। ২৩ জুলাই কাসপারি চিত্রশালাতে কবির চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

মিউনিখ থেকে রবীন্দ্রনাথ ২৪ জুলাই ফ্রাঙ্কফুর্টে আসেন। স্টুডেন্টেন হিলফের (ছাত্র-সাহায্য সংস্থার) চেয়ারম্যান ডঃ রাইনডর্ফ তাঁকে স্টেশনে অভ্যর্থনা জানান। পূর্ব আয়োজিত বক্তৃতার (শিল্পকলার ধর্ম) পরিবর্তে কবি বাংলা ও ইংরেজীতে কবিতা পাঠ করেন।

২৫ জুলাই সন্ধ্যায় কবি স্টুটগার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ২৯ জুলাই মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন। কাসেল থেকে প্রকাশিত 'কাসেলার টাগেব্লাট' পত্রিকাতে ঐ বক্তৃতার এক সুন্দর বিবরণ প্রকাশিত হয়। তা থেকে জানা যায়: "শ্রোতাদের অনুরোধ ক্রমে কবি-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ পূর্ব নির্দিষ্ট বক্তৃতার পরিবর্তে 'ধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ডঃ ওটো তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন যে, ভাষা সৃষ্টির দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন লুথার-এর সঙ্গে তুলনীয়, অপর দিকে

জাতির প্রতি কর্তব্য কর্মে তাঁর প্রচেষ্টা গ্যয়টের প্রচেষ্টার সঙ্গে তুলনীয়। ডঃ ওটোর বক্তৃতা থেকে বোঝা যায় যে, জার্মান ইতিহাস ও সংস্কৃতির দুই অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব রূপ পরিগ্রহ করেছে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে ও মনস্বীতায়।"

৩ আগস্ট কবি রাইন-তীরবর্তী অন্যতম শহর কোবলেনজ-এ কাটান। সেখানে 'ডয়েচে এক' এবং অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শন করেন। লর্ড মেয়র ডঃ বাসেল-এর সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ করেন।

তারপর কবি বার্লিনে ফিরে আসেন। এখানেই কবির জার্মানী সফর শেষ হয়।

১৯৩০ সালের সফরের সময় সেখানে কবির চিত্র প্রদর্শনীর যে-সব সমালোচনা হয়েছে তার অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ করা হল—

বার্লিন থেকে প্রকাশিত 'বার্লিনার টাগেব্লাট' ১২ জুলাই (১৯৩০) 'ফিলসফিক্যাল পেইন্টিং' এই শিরোনামায় লেখেন: "মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর… ..এবার লেখা ছেড়ে আঁকায় মন দিয়েছেন। শোনা যায় ইতিমধ্যে তিনি প্রায় ৫০০ ছবি এঁকেছেন। এই প্রচেষ্টার দ্বারা চিত্রশিল্পের মাধ্যমে দর্শনকে কি তিনি সর্বজনবোধ্য করে তুলতে চাইছেন? অবশ্য সাধারণ লোকেরা দর্শনের তত্ত্বের চেয়ে ছবির বক্তব্যকেই তাড়াতাড়ি ধরতে পারেন। বোধহয় রবীন্দ্রনাথের এই নতুন শিল্পকলা তাঁর অন্তরের রূপান্তরের উপর আলোক সম্পাত করবে।"

১১ জুলাই ডর্টমুণ্ড থেকে প্রকাশিত 'জেনেরালানসাইগার এক ডর্টমুণ্ড' পত্রিকাতে 'চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ' এই মর্মে এক সংবাদ পরিবেশিত হয়। তার অংশবিশেষ এখানে তুলে দেওয়া হ'ল: "আমাদের কালের কিউবিস্টরা যার জন্য চেষ্টা করেছেন তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) দ্বারা তা অংশতঃ সম্ভব হয়েছে—একটি সম্পূর্ণরূপে অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট সৃষ্টি। একটি অদ্ভুত জগৎকে তিনি আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন, রহস্যের আবরণ খুলে দিয়েছেন। যে নিয়মের দ্বারা বিশ্বজগৎ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং যা বিশ্বকে দেবোপমের সঙ্গে যুক্ত করে তিনি তারই পূর্বাভাষ দিয়েছেন।"

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীও কবির অন্যতম ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন। শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্রকে স্টুটগার্ট, মারবুর্গ ও বার্লিন থেকে তিনি যে পত্র লেখেন তা 'প্রবাসী'র কার্তিক, ১৩৩৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় (পৃঃ ৯৭-১০০)। এই মূল্যবান পত্রগুচ্ছ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল—

প্রথম চিঠি ১৫ জুলাই স্টুটগার্ট থেকে লেখেন। তিনি লিখছেন : "সম্রাটের মত জার্মেনী পরিভ্রমণ করচি—শ্রেষ্ঠ যা-কিছু আপনিই আমাদের কাছে এসে পড়চে।...পৃথিবীতে কোথাও রবীন্দ্রনাথকে এর চেয়ে বেশী ভালবাসে ভাবতে পারি না ;...কোনোখান থেকে বিদায় কালে রবীন্দ্রনাথের বন্দনায় যে করুণা, যে বেদনা লোকের মুখে দেখতে পাই তাতে আমাদের মন বিকল হয়ে যায়।"

২৬ জুলাই মারবুর্গে এসে তিনি ঐ চিঠি শেষ করেন। এই অংশে লেখেন : "শুনেচেন নিশ্চয় এদেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা রবীন্দ্রনাথের ছবিকে শিল্প রাজ্যে একেবারে চরম শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েচেন। বার্লিন, ড্রেসডেন, ম্যুনিখ তিন জায়গায় একই সঙ্গে প্রদর্শনী চলচে। এদেশের খবরের কাগজ এই ছবির খবরে উপচে পড়চে, জার্মেনীর সবচেয়ে বড় শিল্পীরা সমস্বরে বলচেন, এর মধ্যে প্রতিভার মন্ত্রশক্তি নূতন সৃষ্টিতে পরম বিকাশ পেয়েচে। প্যারিসেও এমনি মস্ত আন্দোলন হয়েছিল, বার্মিংহামেও তাই, জার্মেনীতে নানা জায়গায় এক সঙ্গে প্রদর্শনী খোলাতে উৎসাহ আরও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েচে।...যে কারণেই হোক্ জার্মেনী রবীন্দ্রনাথের শিল্প-প্রতিভায় অভিভূত হয়েচে। এখানে প্রতিদিন লোকের মুখে, খবরের কাগজে, সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের ছবির বিষয় যা বেরোচ্চে, ভবিষ্যৎ কালে তার থেকে সুসম্বন্ধ একটি ভাবের ধারা বাংলায় প্রকাশ করা দরকার হবে।...

"রবীন্দ্রনাথ কোথাও স্পষ্ট কথা বলতে নিরস্ত হননি। তিনি যেখানে যাচ্ছেন, কত সহস্র লোকের মনকে চিরদিনের মত আমাদের সঙ্গে সত্যভাবে গভীরভাবে মেলাচ্ছেন, কেউ কি তা বুঝতে পারে ?"

১৯ আগস্ট, ১৯৩০ বার্লিন ভানসে, ফ্রিডরিখ, কার্লস্ট্রাবে-১৮ থেকে লিখছেন :

"এখানে সুমধুর সময় কাটল।···আইনস্টাইন কাছেই আছেন, প্রায়ই দেখাশোনা হয়। জার্মেনীতে ন্যাশান্যাল গ্যালারি রবীন্দ্রনাথের পাঁচখানি ছবি চেয়ে নিল। হৈ-চৈ পড়ে গেছে।···

"এখানে যা পেসাম ধন্য মনে তাই নিয়ে এখন দেশের গাছের ছায়ায় নিভৃত অনামা কুটীরে বসে স্বপ্ন দেখতে চাই।"

—'ইউরোপে রবীন্দ্রনাথ' প্রবাসী, কর্তিক, ১৩৩৭, পৃঃ ৯৭-১০০

কলকাতায় জার্মান চিত্র প্রদর্শনী

খাঁটি স্বদেশী রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রকলায় আন্তর্জাতিকতার ছাপ রেখেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তিনি জার্মান এক্সপ্রেশানিস্ট শিল্পীদের এতই ভালবাসতেন যে, তিনি তাদের চিত্রকলার এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন কলকাতায় ১৯২৩ সালে। ওই প্রদর্শনীতে ছিল জার্মান 'বাউহাউস স্কুল' গোষ্ঠীর ছ'জন শিল্পীর আঁকা ছবি—যার মধ্যে ছিলেন ভ্যাসিলি, ক্যাণ্ডিনিস্কি এবং লাইওনেল ফাইনিংগার। ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে বাউহাউস স্কুল গোষ্ঠী ভারতে প্রদর্শনীর জন্যে পাঠান।

ক্যাণ্ডিনিস্কি ছিলেন রুশ। জার্মানীতে আর্ট চর্চা করতেন। জার্মান এক্সপ্রেশানিস্ট শিল্পরীতির তিনি ছিলেন অন্যতম প্রবক্তা।

ফাইনিংগার বাউহাউস স্কুল গোষ্ঠীর শিল্পী; তিনিও এক্সপ্রেশানিস্ট। পরে তিনি পিকাসোর কিউবিজম্ শিল্পকর্মের দিকে ঝোঁকেন।

হিটলারের আমলে ক্যাণ্ডিনিস্কি এবং ফাইনিংগার দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। ক্যাণ্ডিনিস্কি চলে যান প্যারিসে আর ফাইনিংগার চলে যান নিউইয়র্কে। আন্তর্জাতিক বাজারে তখন ক্যাণ্ডিনিস্কির

একটি ছোট স্কেচের দাম বিশ হাজার ডলার। ফাইনিংগারের একটি স্কেচের দাম দশ হাজার ডলার।

বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক রতন পারিমু তাঁর "পেইনটিংস অব থ্রী টেগোর্স" বইতে বছর কয়েক আগে কলকাতায় ঐ জার্মান চিত্র প্রদর্শনীর বিস্তৃত বিবরণ দেন। জার্মান চিত্র প্রদর্শনীর পর সেই ছবিগুলো জার্মানীতে ফেরৎ পাঠাবার কথা ছিল কিন্তু তারপর এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে জামানীতে সেই ছবি পৌঁছয় নি। পরে জানা যায়, ছবিগুলো পঞ্চাশ দশকে চোরা পথে ভারত থেকে আমেরিকায় চলে যায়।

অনেককাল পরে পশ্চিম জার্মান সরকার ঐ ছবিগুলো ফেরৎ পাঠাতে বলেছেন ভারত সরকারকে। ভারত সরকার অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারেন সেগুলো এখন ভারতের বাইরে। কে বা কারা সেই ছবিগুলো আমেরিকায় বেচে দিয়েছে। জার্মান সরকারও ছাড়বার পাত্র নন। তারা চাইছেন একটা আন্তর্জাতিক তল্লাসী হোক।

———

রাশিয়ায়

জার্মানীব পব রবীন্দ্র-চিত্রকলা প্রদর্শনী হল আগস্ট মাসে ডেনমার্কের শার্লোটেনবার্গ এবং সুইৎজারল্যাণ্ডেব জেনেভা শহবে। এর পরে সেপ্টেম্বব মাসে চলে মস্কো শহবে ববীন্দ্র-চিত্রকলাব বিজয় অভিযান। মস্কোর 'গসুদারস্তেভেন্যি মুজেই নোভোগো ৎসাপাদনোগো ইস্কুস্তভা' —মস্কো স্টেট মিউজিয়াম অব ওয়েস্টার্ন আর্ট প্রদর্শনশালায কবিব চিত্র প্রদর্শনী চলে ১৯৩০ সালেব ১৭ সেপ্টেম্বব থেকে ২৮ সেপ্টেম্বব পর্যন্ত।

কবিব সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণ সার্থক হযেছিল। রাশিযাব নব জাগরণে কবি মুগ্ধ হয়েছিলেন। সে সম্বন্ধে কবি বিস্তারিত ভাবে বলেছেন তাঁর 'রাশিয়ার চিঠিতে'। কবি রুশ চিত্ত জয় করতে সার্থক হয়েছিলেন। রুশ ভাষায় বেশ কিছু রবীন্দ্র সাহিত্য অনূদিত হয়েছিল। পরিবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব বই-ই রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো বই রাশিয়ায় কয়েক লাখ কপি বিক্রি হয়েছে। আমি রাশিয়া ভ্রমণে বহু শিক্ষিত রুশের কাছে শুনেছি তিনি রবীন্দ্রনাথের কিছু না কিছু লেখা পড়েছেন।

রাশিয়ায় 'বিশ শতকের সাহিত্য' সংকলনমালায় রবীন্দ্র রচনা সংকলন প্রকাশিত হয়। ঐ সংকলন বিক্রি হয়েছে তিন লাখ কপি। ওতে শুধু রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্প বা উপন্যাস নেই, তার সঙ্গে রয়েছে রবীন্দ্র-চিত্রকলা। রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির জনপ্রিয়তা ওখানে কতখানি এর থেকেই তা বোঝা যাবে।

মস্কোয় চিত্রকলা প্রদর্শনীর সময়ে রবীন্দ্রনাথ রুশ জনগণের চিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। হাজার-হাজার দর্শক এসে ভীড় করেছে চিত্র প্রদর্শনীতে। কেউ কেউ আবার তাঁদের আঁকা ছবি কবিকে উপহার দিয়েছেন। মস্কোর বহু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে চিত্র

প্রদর্শনীর সমালোচনা ও সংবাদ। মস্কোর এক চিত্র সমালোচক কবিকে প্রশ্ন করেছিলেন—আপনি আগে কখনো ছবি এঁকেছেন?

—না।

—আপনার কাজ অনেকটা ভ্রুবেলের মতন। তাঁর আঁকা ছবি কি কখনো দেখেছেন।

—মনে তো হয় না।

—এটা কি দান্তের প্রতিকৃতি?

—না, জাপান থেকে ফেরার পথে এঁকেছি। আমার কলম আপন খেয়ালে চলে। এটি তারই ফলশ্রুতি।

—এ কিসের রঙ।

—নীল ফাউণ্টেন পেনের কালি।

—আপনি অয়েল পেন্টিং আঁকেন?

—না।

—এটা কি মস্কোর ছবি?

—হবে হয়তো।

মস্কোর প্রদর্শনী উদ্বোধনী ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"আমাব ছবিব ভাষা বাশিয়ার মানুষের কাছে সহজে নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছে এজন্য আমি খুবই আনন্দিত। আপনাদের প্রশংসা পেয়ে আমাব আনন্দের সীমা নেই। কারণ আমি জানি এদেশের প্রকৃত শিল্প-রসিকরাই আমার ছবির বিচার করেছেন। এতে আমি গব অনুভব করছি। কিন্তু এ শিল্প আমার কাছে একেবারে নতুন তাই আমি সহজে নিতে পারছি না।"

রুশ বিপ্লবের পর সারা সোভিয়েত দেশ জুড়ে যে পরিবর্তন আসে তা দেখে কবির মনে গভীর রেখাপাত করে। রুশ বিপ্লব শুধু রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন আনে নি। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যে পরিবর্তন আসে তার ফলে জনসাধারণের মননশীলতার উৎকর্ষের দিকটা কবি অনুভব করেন। ক্ষেত-খামারের কৃষক থেকে আরম্ভ করে

কলকারখানার শ্রমিক দল বেঁধে বড় বড় আর্ট মিউজিয়ম ও গ্যালারীতে ভিড় জমাত। তা দেখে রবীন্দ্রনাথ 'রাশিয়ার চিঠি'তে বহুবার বহু জায়গায় বলেছেন—

'রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল। যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোনো দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলছে।

"··কোনো মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্মা হয়ে না থাকে এজন্য কী প্রচুর আয়োজন ও কী বিপুল উদ্যম। শুধু শ্বেত রাশিয়ার জন্যে নয়—মধ্য এশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মতো বেগে শিক্ষাবিস্তার করে চলেছে—সায়াহ্নের শেষ ফসল পর্যন্ত যাতে তারা পায় এইজন্যে প্রয়াসের অন্ত নেই। এখানে থিয়েটারে ভীষণ ভিড়, কিন্তু যারা দেখছে তারা কৃষি ও কর্মীদের দলের। কোথাও এদের অপমান নেই। ইতিমধ্যে এদের যে দু-একটা প্রতিষ্ঠান দেখলুম সর্বত্রই লক্ষ্য করছি এদের চিত্তের জাগরণ এবং আত্মমর্যাদার আনন্দ। আমাদের দেশের জনসাধারণের তো কথাই নেই ইংলণ্ডের মজুর শ্রেণীর সঙ্গে তুলনা করলে আকাশ-পাতাল তফাৎ দেখা যায়। আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েছি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই করছে। আমাদের কর্মীরা যদি কিছুদিন এখানে এসে শিক্ষা করে যেতে পারত তা হলে তার উপকার হত। প্রতিদিনই আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার তুলনা করে দেখি আর ভাবি কী হয়েছে কী হতে পারত।·

" মস্কো থেকে যখন নিমন্ত্রণ এল তখনো বলশেভিকদের সম্বন্ধে আমার মনে স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। তাদের সম্বন্ধে ক্রমাগতই উল্টোডাল্টো কথা শুনেছি। আমার মনে তাদের বিরুদ্ধে একটা খটকা ছিল। কেননা গোড়ায় ওদের সাধনা ছিল জবরদস্তির সাধনা। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখলুম, ওদের প্রতি বিরুদ্ধতা য়ুরোপে যেন অনেকটা ক্ষীণ হয় এসেছে।

"·এখানকার বিদ্যালয়ের মস্ত একটা গুণ, এরা যা পড়ে তার সঙ্গে

সঙ্গে ছবি আঁকে। তাতে পড়ার বিষয় মনে চিত্রিত হয়ে ওঠে, ছবির হাত পেকে যায়, আর পড়ার সঙ্গে রূপ সৃষ্টি করার আনন্দ মিলিত হয়। হঠাৎ মনে হতে পারে, এরা বুঝি কেবলই কাজের দিকে ঝোঁক দিয়েছে, গোঁয়ারের মতো ললিতকলাকে অবজ্ঞা করে। একেবারেই তা নয়।...

"...আর একটা উদাহরণ দিই। মস্কো শহরে আমার ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল। এ ছবিগুলো সৃষ্টি ছাড়া সে কথা বলা বাহুল্য। শুধু যে বিদেশী তা নয়, বলা চলে যে তারা কোনো দেশীই নয়। কিন্তু লোকের ঠেলাঠেলি ভিড়। অল্প কয়দিনে পাঁচ হাজার লোক ছবি দেখেছে। আর যে যা বলুক, অন্ততঃ আমি তো এদের রুচির প্রশংসা না করে থাকতে পারব না।...

"...এখানে ইস্কুলের ছেলেদের আঁকা অনেকগুলি ছবি আমরা পেয়েছি--দেখে বিস্মিত হতে হয়—সেগুলো রীতিমত ছবি, কারো নকল নয়, নিজের উদ্ভাবন। এখানে নির্মাণ এবং সৃষ্টি দুয়েরই প্রতি লক্ষ্য দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছি। এখানে এসে অবধি স্বদেশের শিক্ষার কথা অনেক ভাবতে হয়েছে। আমার নিঃসহায় সামান্য শক্তি দিয়ে কিছু এর আহরণ এবং প্রয়োগ করতে চেষ্টা করব।...

"...এখানে ছবির মিউজিয়মের কাজ কী রকম চলে তার বিবরণ শুনলে নিশ্চয় তোমার ভালো লাগবে। মস্কো শহরে ট্রেটিয়াকভ গ্যালারি নামে এক বিখ্যাত চিত্রভাণ্ডার আছে। সেখানে ১৯২৮ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত এক বছরের মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ লোক ছবি দেখতে এসেছে। যত দর্শক আসতে চায় তাদের ধরানো শক্ত হয়ে উঠেছে। সেইজন্যে ছুটির দিনে আগে থাকতে দর্শকদের নাম রেজিস্ট্রি করানো দরকার হয়েছে।

"১৯১৭ সালে সোভিয়েত শাসন প্রবর্তিত হবার পূর্বে যে-সব দর্শক এইরকম গ্যালারিতে আসত তারা ধনী-মানী-জ্ঞানী দলের লোক, যাদের এরা বলে বুর্জোয়াজি, অর্থাৎ পর শ্রমজীবী। এখন আসে

অসংখ্য স্বশ্রমজীবীর দল, যথা—রাজমিস্ত্রি, কামার, মুদি, দর্জি এবং চাষী-সম্প্রদায়।

“আর্টের বোধ ক্রমে ক্রমে এদের মনে জাগিয়ে তোলা আবশ্যক। এদের মতো আনাড়িদের পক্ষে চিত্রকলার রহস্য প্রথম দৃষ্টিতে ঠিকমত বোঝা অসাধ্য। দেয়ালে দেয়ালে ছবি দেখে এরা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, বুদ্ধি যায় পথ হারিয়ে। এই কারণে প্রায় সব মিউজিয়মেই উপযুক্ত পরিচায়ক রেখে দেওয়া হয়েছে। মিউজিয়মের শিক্ষা বিভাগে কিংবা অন্যত্র তদনুরূপ রাষ্ট্রকর্মশালায় যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক কর্মী আছে তাদেরই মধ্যে থেকে পরিচায়ক বাছাই করে নেওয়া হয়। যারা দেখতে আসে তাদের সঙ্গে এদের দেনাপাওনার কোনো কারবার থাকে না। ছবিতে যে বিষয়টা প্রকাশ করছে সেইটে দেখলেই যে ছবি দেখা হয়, দর্শকেরা যাতে সেই ভুল না করে পরিদর্শয়িতার সেটা জানা চাই।

“চিত্রবস্তুর সংস্থান, তার বর্ণকল্পনা, তাব অঙ্কন, তার অবকাশ, তার উজ্জ্বলতা, যাতে করে তার বিশেষ সম্প্রদায় ধবা পড়ে সেই তার বিশেষ আঙ্গিক, এ-সকল বিষয়ে আজও অল্প লোকেরই জানা আছে। এইজন্যে পরিচায়কের বেশ দস্তুর মত শিক্ষা থাকা চাই, তবেই দর্শকদের ঔৎসুক্য ও মনোযোগ সে জাগিয়ে রাখতে পারে; আর একটি কথা তাকে বুঝতে হবে, মিউজিয়মে কেবল একটি মাত্র ছবি নেই, অতএব একটা ছবিকে চিনে নেওয়া দর্শকেব উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। মিউজিয়মে যে সব বিশেষ শ্রেণীর ছবি রক্ষিত আছে তাদের শ্রেণীগত রীতি বোঝা চাই। পরিচায়কদের কর্তব্য কয়েকটি করে বিশেষ ছাঁদের ছবি বেছে নিয়ে তাদের প্রকৃতি বুঝিয়ে দেওয়া। আলোচ্য ছবিগুলির সংখ্যা খুব বেশি হলে চলবে না এবং সময়ও বিশ মিনিটের বেশি হওয়া ঠিক নয়। ছবিব যে একটি স্বকীয় ভাষা, একটি ছন্দ আছে, সেইটেই বুঝিয়ে দেবার বিষয়; ছবিব রূপেব সঙ্গে ছবির বিষয়ের ও ভাবের সম্বন্ধ কী সেইটে ব্যাখ্যা করা দরকার। ছবির পরস্পর-বৈপরীত্য দ্বারা তাদের বিশেষত্ব বোঝানো অনেক সময় কাজে লাগে।

কিন্তু দর্শকদের মন একটু মাত্র শ্রান্ত হলেই তাদের তখনই ছুটি দেওয়া হয়।

"অশিক্ষিত দর্শকদের এরা কী করে ছবি দেখতে শেখায় তাই একটা রিপোর্ট থেকে উল্লিখিত কথাগুলি তোমাকে সংগ্রহ করে পাঠালুম। এর থেকে আমাদের দেশের লোকের যেটি ভাববার কথা আছে সেটি হচ্ছে এই : পূর্বে যে চিঠি লিখেছি তাতে আমি বলেছি সমস্ত দেশকে কৃষিবলে যন্ত্রবলে অতিক্রুত মাত্রায় শক্তিমান করে তোলবার জন্যে এরা একান্ত উদ্যমের সঙ্গে লেগে গেছে। এটা ঘোরতর কেজো কথা। অন্য-সব ধনী দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজের জোরে টিকে থাকবার জন্যে এদের এই বিপুলসাধনা।...

"...এখানে এরা দেশ জুড়ে কারখানা চালাতে যে সব শ্রমিকদের পাকা করে তুলতে চায় তারাই যাতে শিক্ষিত মন নিয়ে ছবির রস বুঝতে পারে তারই জন্যে এত প্রভূত আয়োজন। এরা জানে, রসজ্ঞ যারা নয় তারা বর্বর : যারা বর্বর তারা বাইরে রুক্ষ, অন্তরে দুর্বল। রাশিয়ায় নবনাট্য কলার অসামান্য উন্নতি হয়েছে। এদের ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরতর দুর্দিন, দুর্ভিক্ষের মধ্যেই এরা নেচেছে, গান গেয়েছে, নাট্যাভিনয় করেছে—এদের ঐতিহাসিক বিরাট নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ ঘটে নি।...

'...রাশিয়ার নাট্যমঞ্চে যে কলাসাধনার বিকাশ হয়েছে সে অসামান্য। তার মধ্যে নতুন সৃষ্টির সাহস ক্রমাগতই দেখা দিচ্ছে, এখনো থামে নি। ওখানকার সমাজ বিপ্লবে এই নতুন সৃষ্টিই অসম সাহস কাজ করেছে। এরা সমাজে, রাষ্ট্রে, কলাতত্ত্বে কোথাও নূতনকে ভয় করে নি।"

ইংলণ্ডে

ইউরোপের নব আর্ট আন্দোলনে ইংলণ্ড খানিকটা পিছিয়ে ছিল। আধুনিক আর্টে পরীক্ষা-নিরীক্ষা যত হয়েছে ফ্রান্সে আর জার্মানীতে, তত হয়নি ইংলণ্ডে। ইউরোপীয় নব আর্ট আন্দোলনের অগ্রদূতরা কবির চিত্রকলাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। ওইসব দেশে কবির আর্ট আলোড়ন আনে। তবে ইংরেজরা এ ব্যাপারে কবিকে কম সম্মান দেয়নি। লণ্ডনে কবির চিত্র প্রদর্শনী হয় ৪ জুন ১৯৩০। এরই মধ্যে হয় বার্মিংহামে ২ জুন থেকে ১৮ জুন ১৯৩০ পর্যন্ত। লণ্ডনের সাহিত্য ও শিল্পরসিকরা রবীন্দ্র-চিত্রকলায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর চিত্রকলা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানান 'রয়েল ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে'। সে বক্তৃতা সম্বন্ধে আগের পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। তাই পুনরাবৃত্তি করছি না।

লণ্ডনে ও বার্মিংহামে প্রদর্শনী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লিখেছিলেন—

C/o American Exp. Co.,
6 Haymarket,
London

কল্যাণীয়েষু

প্যারিসে আমার চিত্রকীর্ত্তি স্বদেশে শ্রুতকীর্ত্তিরূপে হয়তো এতদিনে পৌঁচেচে। উপস্থিত থাকলে খুশি হতে।

অক্সফোর্ডের বক্তৃতাও রীতিমত উৎরে গেছে।

এদেশেও লণ্ডন বার্মিংহামে প্রভৃতি জায়গায় একজিবিশন হবে। সমজদার যারা মফঃস্বলে দেখেচে তারা ভালই বলচে। অতএব এবারে দেশে ফিরলে হয় তো একটা অভিনন্দনপত্র ও ফুলের মালা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু একটা ছবিও ফিরেয়ে নিয়ে যেতে পারব না।

তোমার জন্যে একটা ঠাঁই করবার চেষ্টা করেছি। এখনো সুবিধে হল না। আগামী শুক্রবারে স্যার অতুলের ওখানে নিমন্ত্রণ আছে। অনুরোধ করব তারপরে যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি ইত্যাদি ইত্যাদি।

বলাবাহুল্য ব্যস্ত আছি। এ দেশে না ব্যস্ত থাকা অতি ভাগ্যবান এবং অতি দুর্ভাগা ছাড়া আর কারো আয়ত্ত নয়।

ইতি —২৭ মে ১৯৩০

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কবি গেছেন বার ছয়েক। মার্কিন সাহিত্যিকদের সঙ্গে কবির যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তা জানা যায় কবির লেখা থেকে। মার্কিন অনুরাগীদের প্রচেষ্টায় চার-চারবার রবীন্দ্র-চিত্রকলার প্রদর্শনী হয়। কবির চিত্রকলা সেখানে কতখানি জনপ্রিয়তা লাভ করে এটাই তার প্রমাণ। প্রথম প্রদর্শনী হয় 'মেসার্স ডল্ রিচার্ডস্ গ্যালারি' বস্টনে, অক্টোবর ১৯৩০ এবং একই সময়ে হয় বস্টনের 'মিউজিয়ম অব ফাইন আর্টস' ২১ অক্টোবর থেকে ২০ নভেম্বর ১৯৩০ সালে। নিউইয়র্কে হয় 'দি ফিফ্‌টি সিক্সথ স্ট্রীট্ গ্যালারিতে ১৫ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে। এরপর হয় ফিলাডেলফিয়ায় 'দি নিউম্যান গ্যালারি'তে, পরের বছর ১লা মে থেকে ৮ মে ১৯৩১ সালে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রবীন্দ্র-চিত্রকলা কতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তার আভাস পাওয়া যাবে কয়েকটি মার্কিন সংবাদপত্রের সংবাদ থেকে। যেমন নিউইয়র্ক টাইমস (২৭ অক্টোবর ১৯৩০) লেখে—

নিউ হেভেন, কন ২৬ অক্টোবর, স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতীয় কবি দার্শনিক এবং মানবতাবাদী আজ এখান থেকে ফিলাডেলফিয়া রওনা হয়েছেন। তিনি সেখানে কিছুদিন থেকে তাঁর আঁকা ছবি বিক্রির অর্থ দিয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন করবেন।

হেরাল্ড ট্রিবিউন, নিউইয়র্ক, ২০ নভেম্বর ১৯৩০—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছেন তাঁর নিজের চিত্র প্রদর্শনীতে। এই প্রদর্শনীতে কবির পঁচাত্তরটি জল রঙ ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে।

ভারতীয় কবি ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গতকাল তাঁর চিত্রকলা প্রদর্শনী উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন। এই প্রদর্শনীর আয়োজন হয় ফিফ্‌টি-সিক্সথ স্ট্রীট গ্যালারি, ৬নং ইস্ট ফিফ্‌টি সিক্সথ স্ট্রীটে। কয়েকশত আমন্ত্রিত ব্যক্তি এই প্রদর্শনীর উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন। কবি এই প্রদর্শনীতে তাঁর কবিতা পাঠও করেছেন।

ব্রুকলিন ডেইলি ঈগল, নিউইয়র্ক, ২৩ নভেম্বর ১৯৩০—ফিফ্‌টি সিক্সথ স্ট্রীট গ্যালারিতে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্র প্রদর্শনী চলছে। কবি, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও ধনবিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিগুলো সম্পূর্ণ নতুন দিক খুলে দিয়েছে। তাঁর কল্পনায় ও নতুন দৃষ্টিতে তিনি তাঁর স্বদেশীয় দৃশ্যাবলী অনুপম ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

কবির পাঁচটি ছবি বার্লিনের ন্যাশন্যাল গ্যালারি কিনেছেন। দেড়শটি ছবি প্রদর্শিত হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রবীন্দ্র আনুরাগীর সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, যখনই কবি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন তখনই তাঁর সৃষ্টি নিয়ে হৈ-চৈ হয়েছে। রবীন্দ্র-চিত্রকলার প্রদর্শনী এত বেশী বাব এবং এত দীর্ঘ দিন বোধ হয় আর কোনো দেশে হয়নি। এর থেকেই রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়।

ভারতীর চিন্তাশীলদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর প্রথম নেতা হিসেবে মনে করেন মার্কিন চিন্তাশীল মহল রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্র শতবাষিকীতে কত যে রবীন্দ্র সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে তাব হিসেব-নিকেশ নেই। সারা দেশে এখন কম করে গোটা বার রবীন্দ্র সমিতি রয়েছে। এক নিউইয়র্কে গোটা তুই রবীন্দ্র সমিতি। এইসব রবীন্দ্র সমিতিতে মার্কিন চিন্তাশীল, লেখক ও আর্টিস্টদের যোগাযোগ রয়েছে নিয়মিত।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে নিউইয়র্কেব সেরা পাড়া টাইম স্কোয়ারের নাম বদলে রাখা হয় 'টেগোর স্কোয়ার' দিন দশেকের জন্য। সব কটি বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করা হয়েছিল তখন। আর পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখার হিসেব রাখার জো নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অতি সাধারণ মানুষও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল। শিক্ষিত বা চিন্তাশীলদের কাছে রবীন্দ্রনাথ প্রথম শ্রেণীর জনপ্রিয় লেখক। মার্কিন জনমানসে রবীন্দ্রনাথ চিরস্থায়ী হয়ে আছেন।

স্বদেশে রবীন্দ্র-চিত্রকলা

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁব চিত্রকলা প্রদর্শনী একবারই হয়। অথচ বিদেশে হয় ডজনবাবেরও বেশী। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় দেশে কেন তাঁব চিত্র প্রদর্শনী একবাবের বেশী হয়নি তাই নিয়ে অনুসন্ধান হওয়া উচিত। ভবিষ্যতেব গবেষকবা হয়ত এ সম্বন্ধে নতুন আলোকপাত কবতে পাববেন।

একটি কথাই আমাব মনে বাব বার ঘুবে ফিবে উঁকি মাবে। আমবা মূলত পরশ্রীকাতব। ববীন্দ্রনাথেব সময়ে বহু চিন্তাশীল. লেখক, শিল্পী ও সমাজপতিবা ববীন্দ্রনাথকে ঈর্ষাব চোখে দেখতেন। ববীন্দ্রনাথ শুধু কাব্যে বা উপন্যাসে নতুন পথ দেখান নি, তিনি গদ্য লেখাব ধাবাও বদলেছেন। তাব ওপব নোবেল পুবস্কাব। এসব বহু ব্যক্তি সহ্য কবতে পাবতেন না সেকালে।

ববীন্দ্রনাথ কি শুধুই সাহিত্যিক, শিল্পী? স্বদেশী আন্দোলনে তাঁব নেতৃত্ব, স্বদেশী গান এবং গঠনমূলক কাজে তিনি অদ্বিতীয়। বিশ্বভাবতী যাব নিদর্শন। নাটক, গীতিনাট্য এসবেব পর আবাব রবীন্দ্রনাথকে আর্টিস্ট হিসেবে মেনে নিতে বহু ব্যক্তিব বুক ফেটে যেত। প্রথমত, ববীন্দ্র চিত্রকলা কেন, কোন চিত্রকলা বোঝাব মতন মানসিকতাও ছিল না সেকালেব বহু চিন্তাশীলদেব। ফলে ববীন্দ্রনাথকে এই ধবনেব মানসিক অশান্তি ও অভিমান সহ্য কবতে হয়েছে। বহু ববীন্দ্র সাহিত্য ও শিল্প সমালোচকও আর্টিস্ট ববীন্দ্রনাথকে স্রেফ এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু কেন জানি না।

দেশবাসী ববীন্দ্র-চিত্রকলা দেখার প্রথম সুযোগ পেল ১৯৩২ সালে। কলকাতাব গভর্নমেণ্ট স্কুল অব আর্ট-এ ববীন্দ্র-চিত্রকলাব প্রথম প্রদর্শনী হয় ২০ থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ সালে। ববীন্দ্রনাথের জীবনে তাঁর নিজের দেশে এটাই প্রথম ও শেষ প্রদর্শনী। প্রদর্শনীতে ছিল ২৬৫ খানা ছবি। ছবিগুলোর নাম দেন আর্টিস্ট মুকুল দে।

ছবিগুলোর নাম ইংরেজীতে লেখা হয়। ছবির দাম নির্ধারণ করেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রদর্শনীর সময়ে চিত্র পরিচিতি নিয়ে একটি ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়। ওই পুস্তিকা বা ক্যাটালগের ভূমিকা লেখেন শিল্পী মুকুল দে। মুকুল দে লেখেন, 'যখন ভারতবর্ষে খবর এলো যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি প্যারিসে প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, তখন এদেশেব বহু লোক বিস্ময় প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ ছবি আঁকিয়ে হন নি। তাঁর অন্তরে শিল্প-চেতনার বীজ বহুকাল আগে বপন হয়েছিল। ষোল বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন এবং সেখানে টার্ণার ও অন্যান্য ইউরোপীয় শিল্পীদের কাজ তাঁর মন জয় করে।'

রবীন্দ্রনাথেব ২৬৫টি ছবিব ইংবেজী শিরোনামা এবং তার দাম দিয়ে আমি কয়েকটা ছবির নমুনা দিচ্ছি—

১।	দি ওপেনিং অব এ বাড	১,২৫০ টাকা
২।	এ হেড স্টাডি ইন ব্লু, ব্ল্যাক এ্যাণ্ড রেড	৩০০ ,,
৪।	টু দি সী	৬৫০ ,,
৬।	ইন ফিউরিয়েটেড বিশ্বামিত্র	৭৫০ ,,
৮।	রিস্কারিং দি ভিক্টিম	১,০০০ ,,
১২।	ফ্লাওয়াব অশরিংস	৫০০ ,,
৩৪।	দি কক্	১৫০ ,,
৫১।	গ্রিম ডিটারমিনেশান	৭৫০ ,,
৫২।	নটীর পূজা—দি লাস্ট ডান্স	২২৫ ,,
৫৩।	মাদার এ্যাণ্ড চাইল্ড	১৫০ ,,
৫৭।	স্টাডি অব এ হেড	৫৫০ ,,
৮১।	দি ক্যাপটিভ	২০০ ,,
৮৪।	দি ভিলেজ মেড	১৭৫ ,,
৮৬।	এ্যাণ্ড্রুজ এ্যাণ্ড মাইসেল্ফ	১৭৫ ,,
৯৯।	রে অব হোম	৩৫০ ,,

১০৬।	গ্রিপ অব লভ্	২৫০ ,,
১১৩।	দি বয়	৬০ ,,
১১৮।	রাধা এ্যাজ মিল্কমেড্	২৫০ ,,
১২৩।	সেল্ফ পোট্রেট্	২৫০ ,,
১৫৩।	দি ইয়ং ফল্ ইন দি ডার্ক নাইট	২৭৫ ,,
১৫৬।	কচ এ্যাণ্ড দেবযানী	১০০ ,,
১৬৭।	দি ডাস্টার	৬৫ ,,
১৬৯।	দি কনসোলার	৩৫০ ,,
১৭৫।	ল্যাণ্ডস্কেপ, শান্তিনিকেতন	১৫৭ ,,
১৭৯।	দি মাস্ক	১৮০ ,,
১৯১।	সি হ্যাজ কমিটেড সুইসাইড !···	৫০০ ,,
২০৫।	অন দি ওয়ে টু দি লভার···	২২৪ ,,
২১৩।	লভার্স ইন দি মুনলাইট	৩০০ ,,
২৩১।	ম্যান এ্যাণ্ড দি বিস্ট	২৭৫ ,,
২৪৭।	দি জাজ্	৭৫০ ,,
২৫৫।	এওয়েটিং ফর হিজ এ্যারাইভাল	৭৫০ ,,
২৫৮।	দি এ্যাকসেপ্টেন্স-ব্রাইড এ্যাণ্ড ব্রাইডগুম	৪৬৫ ,,
২৬২।	রুইণ্ড বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রি	৮০০ ,,

ক্যাটালগে ছবির নাম দেওয়া এবং সেগুলো ইংরেজী ভাষায় হওয়ায় কবি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এনিয়ে নানা কাহিনী শোনা যায়। যাইহোক ওই প্রদর্শনী রবীন্দ্র-সাহিত্য ও শিল্পের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে বহুকাল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বম্বে ও কলকাতায় প্রদর্শনী হয়। ১৯৪৭ সালে হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ বিল্ডিং-এ। ওই প্রদর্শনীর আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র-পরিষদ। তারপর রবীন্দ্র-চিত্রকলা প্রদর্শনী হয়েছে ভারতের বহু শহরে বহুবার। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে হয়েছে সারা দেশ জুড়ে। ভারত সরকার রবীন্দ্র-চিত্রকলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা প্রায়ই করেন দেশে ও বিদেশে।

শিল্পী ও অনুরাগীদের চোখে রবীন্দ্র-চিত্রকলা

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষেব দিকে একনিষ্ঠ সহচর এবং সহযোগীর কাজ করেছেন শ্রীঅনিল চন্দ। ব্যারিস্টার অনিল চন্দ বিশ্বভারতীতে কিছুকাল অধ্যাপনার কাজও করেছেন। পরবর্তীকালে শ্রীচন্দ লোকসভার সদস্য, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় পবরাষ্ট্র দপ্তর থেকে পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন এক যুগেরও বেশী।

রবীন্দ্র অনুরাগীদের অন্যতম শ্রীঅনিল চন্দ মাঝামাঝি পরলোক গমন করেছেন। ২৬ জানুয়ারী তারিখে আমি তাঁর শান্তিনিকেতনের বাড়ীতে আর্টিস্ট রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বেশ কিছু প্রশ্ন তুলে ধরেছিলাম। আমার প্রশ্নেব উত্তরে শ্রীচন্দ যা বলেছিলেন আমি তা হুবহু তুলে দিচ্ছি—

"ছোটবেলা থেকে সূর্যোদয়ের বহু আগেই ঘুম থেকে ওঠা অভ্যেস ছিল কবিগুরুর। ঘুম থেকে উঠে তিনি বেশী দুধ দিয়ে চা বা কফি খেতেন। তাবপর শুরু হত তাঁর কাজ। কবিতা লেখার মতন তাঁর ছবি আঁকারও সময় অ-সময় ছিল না। ছিল না কোন নির্ধারিত সময়। যখনই মনে করতেন তখনই লিখতে বসতেন বা ছবি আঁকতেন।

"আমি ১৯৩৩ সালে ওঁর সঙ্গে থাকতে আরম্ভ করি। উনি ছবি আঁকা শুরু করেন তার অনেক আগে। একটা ঘটনা মনে পড়ছে। ১৯৩৪ সালে আমরা মাদ্রাজ গিয়েছিলাম। অনেক জায়গা ঘুরে গিয়েছিলাম। তখন রায়পুর স্টেশনে অপেক্ষা করছি অন্য ট্রেনের জন্য। কবি ওয়েটিং রুমে বসে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। বহুবার আমরা বোলপুর স্টেশনে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছি হয়ত। তখনও দেখেছি কবি ওখানেই ছবি আঁকতে শুরু করেছেন। কোনো সময় বা ক্ষেত্র-

বিশেষের জন্য উনি অপেক্ষা করতেন না বা ছবি আঁকার বিশেষে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন না।

"কখনো মডেল-টডেল, ফুল বা গাছ-টাছ সামনে রেখে উনি ছবি আঁকতেন না। একবার আমার স্ত্রীকে ঠাট্টা করে বললেন—বস্ এখানে তোর ছবি আঁকি। একবার তিনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ছবি এঁকেছিলেন।

"ছবি আঁকার সময়ে নীল রঙটা উনি ঠাওর করতে পারতেন না। কবি নিজেই একথা বলতেন। সবুজ আর নীল রঙ গুলিয়ে ফেলতেন।

"শান্তিনিকেতনকে নিয়ে কবি কিন্তু খুব বেশী ছবি আঁকেন নি বললেই চলে। আবেকটা জিনিস, উনি কিন্তু দিনেব বেলায় কাজ করতেন। সন্ধ্যের আগেই লেখা-আঁকা সব সাঙ্গ করতেন। দুপুবে কখনো ঘুমোতেন না। সূর্যের আলো যতক্ষণ ততক্ষণ একটানা কাজ করতেন। শেষের দিকে গান্ধীজী ওঁকে অনুরোধ কবেন, উনি যেন দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেন। গান্ধীজী ওঁর কাছ থেকে কথা আদায় করে নেন বটে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে অনুরোধ পুরোপুরি রাখতে পারেন নি। তাঁর বহুকালের অভ্যেস মতন তিনি দুপুরে দিবা নিদ্রা না দিয়ে কাজ করতেন। ওই সময়ে লেখার সঙ্গে ছবি আঁকার কাজও চলত তাঁর।"

আবেকজন ববীন্দ্র অনুরাগী, তিনি আবার শিল্পী এবং কলাভবনের প্রথম সঙ্গী। তিনি হলেন শ্রীনন্দলাল বসু। শিল্পী নন্দলাল বসু রবীন্দ্র-চিত্রকলা সম্বন্ধে বলেছেন—"আমরা যতদূর জানি তাতে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে কলাচর্চাকে উপযুক্তস্থান দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্ববিদ্যালয়েব বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থার জন্য তিনিও পদে পদে বাধা পাচ্ছেন এবং পেয়েছেন। কলাচর্চার স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে না থাকায় অভি-ভাবকগণ কলাচর্চাকে অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় বোধ করেন, ফলে যে সমস্ত ছেলেদের ছোটবেলায় নানা কলাশিল্পের চর্চায় বিশেষ অনুরাগ দেখা গিয়েছিল—তারাও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার দু-এক বৎসর আগে থেকে

কলাচর্চার অপ্রয়োজনীতা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে এবং তাদের শিল্পানুরাগ এই সময় থেকে কমতে কমতে একেবারে তিরোহিত হয়। এ বিষয়ে আমাদের সকল প্রকার জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অবহিত হবার সময় এসেছে।…"

—'শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান'—শ্রীনন্দলাল বসু, বিশ্বভারতী পত্রিকা : নন্দলাল বসু সংখ্যা পৃঃ ৮৫।

রবীন্দ্র-চিত্রকলার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নন্দলাল বসু তাঁর 'চিত্রশিল্পী গুরুদেব' প্রবন্ধে বলেছেন—'রূপশিল্পী জেনে বা না জেনে নানা কলার সাহায্যে প্রকৃতি থেকে পাওয়া বিচিত্র রূপের, বর্ণের ও ছন্দের শিল্প সৃষ্টি করে আনন্দ পাচ্ছেন।'

প্রকৃতি সর্বদাই সৃষ্টি করে কেন তার কারণ সব সময়ে জানা যায় না, শিল্পীরও সৃষ্টির কারণ সব সময়ে তাঁর কাছে স্পষ্ট নয়। প্রকৃতির মতোই তিনি এসব ভাব, গতি ও ভঙ্গির সাহায্যে কেবল রূপ-সৃষ্টির জন্যেই সৃষ্টি করেন, তাতেই তাঁর আনন্দ।

কোনো খাঁটি শিল্পসৃষ্টি বোঝাতে যাওয়া বৃথা, শিল্পসৃষ্টি বোঝাবার বা বিশ্লেষণ করবার জিনিস না, ওটা অনুভবের জিনিস।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, গুরুদেব ছবি আঁকার জটিল কৌশল ও ট্র্যাডিশান (ঐতিহ্য) না জেনেও কি করে ছবি আঁকলেন? তবে কি কেবল খেয়াল-খুশীর ঝোঁকে যা-তা আঁক-জোক পেড়ে গেছেন? মিছিমিছি তাঁর দুর্মূল্য সময় নষ্ট করেছেন?

ছবি জিনিসটা মানুষের মনের ভাবের অভিব্যক্তি। সেই ভাব প্রকাশ করার সংকেতের ভাষা জানা প্রত্যেক জীবের স্বভাবসিদ্ধ। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই, হেসে, কেঁদে, ভঙ্গি করে, শব্দ করে জীব নিজ নিজ মনোভাব প্রকাশ করে থাকে।

গুরুদেব শিল্পী হয়েই এসেছিলেন এবং চিত্রশিল্পী হবার আগেই ভাষা-শিল্পের আঙ্গিকে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন ও জগদ্বিখ্যাত হয়েছিলেন। শিল্পীজনোচিত প্রকাশ-ভঙ্গির প্রাণবত্তা, ছন্দ ও সুষমার

স্বাভাবিক জ্ঞান, চিন্তার ঐশ্বর্য ইত্যাদি সম্বন্ধের অধিকারী ছিলেন চিত্রশিল্পী হবার পূর্বেই।

এইসব কারণে তিনি শিল্পের অতি সামান্য কৌশলের সাহায্যে বহু বিচিত্র চিত্র সৃষ্টি করেছেন।

একালের শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। অগ্রণী ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর দেহবসান ঘটে ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী একজন বলিষ্ঠ শিল্পী। কেবল মাত্র ভাস্কর হিসেবেই তাঁর পরিচয় নয়। একাধারে তিনি চিত্রকর এবং লেখক। মাদ্রাজ গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজে তিনি দুই দশক ধরে ছিলেন প্রিন্সিপ্যাল। তাঁর ভাস্কর্যের পরিচয় পাওয়া যাবে কলকাতা শহরে—যেমন পার্ক স্ট্রীটের সামনে গান্ধীজীর মূর্তি। এমনি বহু মূর্তি ছড়িয়ে আছে সারা দেশ জুড়ে। কিন্তু তিনি একজন চিত্র-শিল্পীও ছিলেন এবং চিত্রকলার সমালোচক হিসেবেও তাঁর মনীষা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার মতো। রবীন্দ্র-চিত্রকলা সম্বন্ধে দেবীপ্রসাদের প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি নিচে তুলে দিচ্ছি—

"কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রকলা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে তাঁরই আঁকা কোন চিত্রপ্রদর্শনী উদ্বোধন উপলক্ষে বলেছি, চলতি মতে তাঁর ছবি কোন বিশেষ শাস্ত্রধর্মী নয়। কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রূপ ধরার প্রথায় আকস্মিক ঘটনা যাকে ইংরেজীতে বলে Accident তাঁর প্রধান সহায় হয়েছে। লেখার অমনোনীত অংশে একের পর এক কাটা-কুটিতে যে আবর্জনার মত অপ্রিয় দৃশ্য লেখার মাঝখানে ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল তাকে এড়াবার কোন গতি না থাকায় উৎপাত থেকে উদ্ধারের জন্য তাঁকে সচেষ্ট হতে হয়েছিল, ফলে জমাট হিজিবিজির সমষ্টিগত রূপের মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করলেন সুন্দরের আবির্ভাব। ছবি এলো কবির কথার মোড় ঘুরিয়ে শিল্পীর কথা বলার জন্য, যে কথা কেবল রূপের গণ্ডিতেই আবদ্ধ। এই সীমিত পরিধির মধ্যেই একাধিক পাতায় ভরা কথ্য ভাষার বক্তব্যকে হঠাৎ পাওয়া অযাচিত

রূপ একটিমাত্র পাতায় শিল্পীর বক্তব্যকে বোঝার আওতায় নিয়ে এলো। বক্তব্য জানালো সুন্দরের আগমনী বার্তা। শিল্পী দেখলেন বিশৃঙ্খল আঁচড় কাটার ভীড়ে ছবির উঁকি। এইখানেই রবীন্দ্রনাথ নিজের শিল্পীমনের কাছে ধরা পড়লেন। অন্তরের শিল্পী প্রকাশ্যে বেরিয়ে এলো তাঁকে সুন্দর ধরার কৌশল ব্যবহারের দীক্ষা দিতে। অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়া কবিকে দেখিয়ে দিয়েছিল রূপকথার দেশ, যেখানে রেখার অসংলগ্ন হুড়োমুড়ি বিশৃঙ্খলা থেকে ত্রাণের জন্য শিল্পীকে ডাক দিয়ে চলেছে। ছবির রূপ যেন বেরিয়ে আসতে চায় শিল্পীকে সুন্দরেব সংস্পর্শে আনার জন্য। ছবি কোন অজানা প্রাচীন যুগের কাহিনী বলছে নানা আকার নিয়ে; বলছে রসের কথা, যে রস বাঁধন ছাড়া ভাষাকে বাহন কবে উচ্ছ্বাসকে রূপ দিয়ে প্রাণবান করে তুলেছে।

'এই হঠাৎ পাওয়া রূপ ছবিকে ঘসামাজা পালিশ করা ব্যস্তবসম্মত সাদৃশ্য খোঁজার তাগিদ থেকে সরিয়ে যখন আপন সত্ত্বাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে, বলতে চাইছে, শিল্পীর সৃষ্ট রূপ কেবল সুখ-দুঃখ বা হাসিকান্নাব কথাই বলে না সে জানতে চায় সুন্দর যখন আপন সত্ত্বাতেই প্রতিষ্ঠিত তখন তুলনাব ঠেকায় অথবা চিত্রাঙ্কনেব সাংস্কারিক বীতি মেনে শিল্পীকে চলতি নিয়মের আশ্রয় নিতেই হবে এমন শর্ত সুন্দরের আইনে বাঁধা নেই। কারণ সুন্দর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। কেবল তাকে চেনা এবং খুঁজে বার করার জন্য উপযুক্ত দৃষ্টির দরকার। আসল শিল্পীর কাছে বাইবেকার তাগিদ অনাহুত হওয়ায় শিল্পী নিজের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসকে স্বীকৃতি দিতে ব্যাধ্য হলো। এইখানে প্রশ্ন ওঠে সুন্দরের যখন কোন নির্দিষ্ট রূপ নেই তখন সব চলতি মতকেই নির্বিচারে মেনে নেওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। শিল্পীর পক্ষে তো নিশ্চয়ই নয়। কারণ যে ছবিতে রূপ ধবে প্রথম নিজের আনন্দের জন্যে। আঁকা হয়ে যাবার পরে ছবির প্রতিক্রিয়া কার উপর কিভাবে প্রতিফলিত হবে তা হিসাব করার সময় শিল্পীর পক্ষে যোগাড় করা কষ্টকর হয়। সুতরাং কবির আঁকা ছবিকে কোন **Tradition, Style,**

Technique ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করে ভালমন্দের মানদণ্ডে চড়ানো চলে না। তাই বলি, তাঁর ছবিতে তাঁর প্রকাশভঙ্গী বিচার করতে হলে আমাদের যুগের মানুষকে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে যেখানে সুন্দর হিসাবের বাইরে থেকে রসিককে আনন্দ দেয়।"

—'চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ', দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, অমৃত, ৩১ অক্টোবর সংখ্যা

একালের আরেক বলিষ্ঠ ও খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী শ্রীঅতুল বসু কলকাতার গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন দুই দশক। তিনি ভারতীয় আর্ট জগতে নেতৃত্ব করেছেন অর্ধশতাব্দী ধবে। শ্রীবসু পরলোক গমন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র চিত্রকলাব সঙ্গে শ্রীঅতুল বসুব সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। অতুল বসুর শিল্পকলার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ভারতীয় শিল্পকলাব ইতিহাসে অতুল বসুব নাম খোদিত হয়ে আছে। রবীন্দ্র চিত্রকলা সম্বন্ধে আমি কিছু প্রশ্ন বেখেছিলাম শিল্পী অতুল বসুর কাছে তাব উত্তরে তিনি যা বলেছেন তা লিপিবদ্ধ কবেছি তারই অংশ বিশেষ এখানে তুলে দিচ্ছি—

প্রশ্ন: ববীন্দ্রনাথেব জীবদ্দশায় রবীন্দ্র চিত্রকলা কেন তখনকাব চিত্রশিল্পীদের কাছে প্রশংসা লাভ কবেনি?

উত্তরে অতুল বাবু বলেছেন: রবীন্দ্রনাথ বহুবার তাঁর লেখাব স্টাইল বদলেছেন। তেমনি ১৯০৫-১৯০৭ সালে তার আর্ট সম্বন্ধে যে মতবাদ ছিল তা তিনি পাল্টান ১৯১৫-১৯১৭ সালে। তাব কিছুকাল পরে এই নিয়ে কবির সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসুর মতবিরোধ দেখা দেয়।

কবি ১৯২০ থেকে ১৯২৮ এই ক' বছরের মধ্যে বহু ছবি এঁকেছেন। আবার এই সময়টা ছিল বিশ্বভারতীর পরিচালনা নিয়ে কবির মনে দুশ্চিন্তার যুগ। তাছাড়া আরও অনেক দুঃখ তাঁর মনে জমেছিল। মনের সব দুঃখ তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন ছবির মারফৎ। তাই

এই সময়ে তাঁর আঁকা অধিকাংশ ছবি 'বিষাক্ত নীল' রঙ আর লাল রঙের। অর্থাৎ বিষাদে রক্ত ঝড়ছে। মনের বিষাদভার তিনি প্রকাশ করছেন 'বিষাক্ত নীল' রঙে। আর লাল রঙ হচ্ছে মনের ভেতরের রক্ত ঝড়া।

ওই সময়ে আঁকা তাঁর নিজের সেলফ পোট্রেটের চোখ দেখলে বোঝা যাবে তিনি তখন কত বেদনাতুর। একটা অস্থির ভাব ছিল তখন তাঁর মনে। ইউরোপে 'ফোবে ইজমে' তখনকার আর্টিস্টদের বিমুগ্ধভাব প্রকাশ পেয়েছে ওইভাবে।

রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকার সময়ে অ্যাকাডেমিক্যাল নিয়ম মানতেন না। পেন্সিলের সঙ্গে পেন তার সঙ্গে প্যাস্টেল রঙ যা তিনি ব্যবহার করেছেন, তা কোনো আর্টিস্ট কোনো দিন করে না।

রবীন্দ্র-চিত্রকলার মূল্যায়ন হল না আজ পর্যন্ত। তার কারণ দেশে ভাল আর্টক্রিটিক অর্থাৎ চিত্র-সমালোচক নেই বলে। রবীন্দ্র-চিত্রকলা সম্বন্ধে হয় কেউ কেউ সাংঘাতিক উচ্ছ্বাসে পাতা ভরিয়েছেন নয়তো তাঁকে সাংঘাতিক ভাবে সমালোচনা করেছেন। আমার মনে হয় সম্ভবত শ্রীমতী স্টেলা ক্রামরিশ রবীন্দ্র-চিত্রকলা সম্বন্ধে কিছুটা মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন। তারপরে যাঁরা করেছেন তাঁরা হলেন শাহেদ সুরাবর্দি, নীহাররঞ্জন রায়, সুধীন দত্ত আর বিষ্ণু দে।

একালের আরেক শিল্পী চিন্তামণি কর। ভাস্কর হিসেবে দেশ-বিদেশে পরিচিত। চিন্তামণি কর প্যারিসে ও ইউরোপেব বহু দেশে প্রায় এক দশক শিল্পচর্চা করেছেন। কলকাতা গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট-এ প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন আট বছর। শিক্ষা-জগৎ থেকে তিনি অবসর নিয়েছেন কিন্তু শিল্পচর্চা থেকে নয়। শিল্পী চিন্তামণি কর ববীন্দ্র-চিত্রকলা সম্বন্ধে যা বলেছেন—

"মহাকবি রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সে গভীর নিষ্ঠা সহকারে ছবি আঁকা সারা জগতের সমসাময়িক সাংস্কৃতিক পটভূমিতে এক অস্বাভাবিক বা অভাবনীয় দৃষ্টান্ত বলা চলে না। খ্যাতিমান স্প্যানিস্

কিউবিস্ট চিত্রকর রাফায়েল আল্‌বার্তির (Rafael Alberti) পরিবেশে কাব্যানুপ্রেরণার আতিশয্যে কাব্যসৃষ্টিতে নিজেকে স'পে দেওয়া এবং কবির পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা পাওয়াকে পাশ্চাত্ত্যে কারুর মনে অদ্ভুত কিংবা অভাবনীয় ঘটনা বলে মনে হয় নি। কেবল ভারতে এ ধরনের উদাহরণ সচরাচর আমাদের নজরে আসে নি বলে কবির চিত্রজগতে বিশিষ্ট স্থানাধিকার এক অসাধাবণ সংগঠন বলে অনেকের মনে হয়েছে এবং তাঁর ছবি আঁকা পরিণত বয়সের একটা খেয়ালের বিশাল বিবেচনায় সমসাময়িক অনেকে তাঁর রচিত শিল্পকে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাধান্যময় শিল্প বচনার আখ্যা বা প্রতিষ্ঠা নিতে দ্বিধাবোধ করে-ছিলেন। কবিব আপন শিল্প সৃজনপ্রতিভা সম্বন্ধে নিরভিমানিতাও কিছুটা ঐ ধারণা পোষণে সাহায্য ও পক্ষপাতিত্ব করেছে। তিনি বলেছেন—

"আমি যা আঁকি তা মনেব অগোচবে। ইচ্ছা করে আঁকা বা আঁকতে চাওয়া আর একটু রূপ দেওয়া—তা আমার দ্বারা হয় না। হিজিবিজি কাটতে কাটতে একটা কিছু রূপ নিয়ে যায় আমার আঁকা, একে কি আর্টিস্ট বলে। তোমবা আমায় স্তুতিবাক্যে ভোলাও—দেখো না কতগুলো মাথা-মুণ্ডই আঁকলুম। কোনটার গোঁফ আছে ; কোনটার নেই, কেউ বেঁকে আছে কোনটা অদ্ভুত—এর কি কোন মানে আছে ?"

—আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু যে expressionism-এর জন্ম হয়েছে ঐ পথে ও প্রক্রিয়ায় একথা তাঁর অজানা ছিল মনে হয় না। তাঁর বেঁকে যাওয়া বা অদ্ভুত মাথাগুলি, বাস্তবধর্মী ও শিল্পবচনা কৌশলেব সকল মুন্সিয়ানাপূর্ণ প্রতিকৃতির অতীত, মানবচরিত্র ও অনুভূতির অন্তর প্রতিমার প্রজ্বলিত রূপকে দর্শকের দৃষ্টিব গভীবে সুনিপুণভাবে পৌঁছে দিতে সক্ষম। কবি তাঁর আঁকা ছবি সম্বন্ধে নিজে যাই বলুন, Sickert-এর কথায় বলা যায় যে—"A painter can usefully defend his own painting with the brush. What he urges in speech or

writing in his own favour is really not evidence." একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শিল্পের ক্ষেত্রে কবির অনুপ্রবেশ আধুনিক ভারতীয় শিল্পের ক্রমবিকাশের পথে একটি বিশিষ্ট অধ্যায়কে চিহ্নিত করেছে এবং বর্তমানে তাব গুরুত্ব যতটা উপলব্ধি হয়েছে ভবিষ্যতে তা হয়ত আরো স্পষ্টতর হয়ে উঠবে।···

আধুনিক ভারতীয় শিল্পের প্রথম বোধনের অগ্রদূত শিল্পীদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথকে eclectic ও গগনেন্দ্রনাথকে exotic এবং রবীন্দ্রনাথকে অনায়াসে revolutionary বলা চলে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পধারণা সম্বন্ধে লিখিত অনেক নিবন্ধ রেখে গেছেন এবং সেগুলিতে যদিও বা কোথাও কোথাও প্রায় অসঙ্গত ও আত্মবিরোধী মতামতের আভাস ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু নবশিল্পের রূপায়ণে তিনি যে ঐতিহ্যগত ভারতীয় শিল্পের পরিধির বাইরে অভিযান করতে বিশেষ উৎসুক ছিলেন না তা পরিষ্কার প্রতীয়মান হয়। অথচ তার চিত্ররচনায় ইংরেজী জলরঙ শৈলী ও জাপানী 'ওয়াস'-এর যথেচ্ছ ব্যবহার তিনি করেছিলেন দ্বিধাহীনভাবে। গগনেন্দ্রনাথ আপন-শিল্প রচনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখেন নি বা বলেন নি। কিন্তু তাঁর ছবিতে সমকালীন ইউরোপীয় শিল্পধারার সঙ্গে নিবিড় আত্মিক সম্পর্ক সুস্পষ্ট দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তিত ভারতীয় নবশিল্পের আত্মবিকাশের রূপধারণা সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে তার উক্তিতে—"আমার দেশবাসীর কাছে আমার নিবেদন এই যে পুনরাবৃত্তির পথে চলা আমাদের অভ্যাস নয়। নতুনের পথে ভুল করে যাওয়াও ভাল—তাতে মৃত্যু ও পরিপূর্ণতা আনে।" (১৩৪১)

কিংবা—'I strong urge our artists vehemently to deny their obligation carefully to produce something that can be labelled as Indian art according to some old world mannerism. Let them proudly refuse to be herded into a pen like branded beasts that are treated as cattle and not as cows."

অথবা—

"Let us take heart and make daring experiments, venture art into the open road in the face of all risks, go through experiences in the great world of human mind, defying unholy prohibitions preached by prudent little critics, laughing at them when in their tender solicitude for our safety they ask our artists to behave like good children and never to cross The Threshold of their schoolroom." —Art & Tradition.

শিল্পে ভারতীয় সত্তাকে ধরে রাখবার বা বাঁচাবার জন্য যাঁরা উৎকণ্ঠিত তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন—

"আমি বলব, আমি কাউকে জানি না, কাউকে মানি না, আমরা যা কিছু সৃষ্টি করি না কেন, তার মধ্যে ভারতীয়ধারা আপনি যাবে। আমাদের সেই আত্মা, সেই ভারতীয় প্রকৃতি তেমনি আছে যেমন পুরাতনকালে কীর্তন গানে, বাউলে ছিল। সেই রকম আজ যদি বাঙালি আপনাকে সংগীত চিত্রকলায় প্রকাশ করতে ইচ্ছে করে তবে সেই প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করতে পারবে না, যদি একমাত্র লক্ষ্য থাকে যা কিছু করবে নিজেকে মুক্ত করে নকল করে নয়।" (১৯৩৪)

রবীন্দ্রনাথের চিত্ররচনার প্রথম প্রচেষ্টা লেখনীর ব্যবহার ও লিপিরূপ প্রভাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এবং এই প্রভাবের ছাপ দেখা যায় কলমের রেখায় করা নক্সার প্রতিকৃতি রচনের মধ্যে, যাদের বাস্তব প্রতিরূপকরণের চেয়ে তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অন্তরের ভাবব্যঞ্জনাকেই পরিস্ফুট করে তোলা। তাঁর আঁকা ছবির ক্রমবিবর্তনে দেখা যায় যে, লেখনী ও লিপির জালবোনা অঙ্কনরীতির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে পরে মানুষের মুখ ও রূপ আরো চিত্রধর্মী ভাবের প্রাধান্য পেয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ সমকালীন শিল্পজগতের পরিবর্তন, পরিবর্জনের গতিবিধি সম্বন্ধে সর্বদা অবহিত ছিলেন এবং ইউরোপের আধুনিক শিল্পের বহমান ধারার সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল অন্তরঙ্গ। আধুনিক শিল্পধারার একনায়কশিল্পী কানদিনস্কির (Kandinsky) সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত

আলাপ ছিল এবং তাঁরা পরস্পরে পত্রবিনিময় করতেন। ইউরোপীয় আধুনিক শিল্প ও শিল্পীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয়ের পর বোধ হয় তাঁর লিপিপ্রভাবী চিত্ররূপে বিশেষ পরিবর্তন আসে এবং তুলি ও রঙ-এর স্বাধীন ব্যবহার রূপায়ণ করেছে তাঁর শেষদিকের আঁকা কাল্পনিক গাছ-গাছালির পটভূমিতে নানা অনুভূতির প্রতিভার প্রতীকরূপে দাঁড়ান নারীমূর্তি কিংবা অতি নির্জন নীরব ও নীথর নিসর্গ এক অব্যক্ত আসন্ন ঝঞ্ঝা বা কোন এক আকস্মিক সম্ভাবনার কল্পরূপায়ণে তাঁর ছবি নরওয়ের বিখ্যাত expressionist শিল্পী মুঙ্ক (Munch)-এর রচনার সঙ্গে তুলনীয়।···

কবির শেষের দিকের আঁকা ছবিতে দেখা যায় যে, সে রচনাগুলি কেবল বর্ণপ্রাধান্যময় হয়েছিল তা নয় সেগুলি বাস্তবেব স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞানরূপ নানা কাল্পনিক আকৃতি—আংশিক দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রকৃতির ও আংশিক অন্তরদৃষ্ট রূপেব প্রতিচ্ছবির এক মোহসঞ্চারী সঙ্গতির অপূর্ব অবতারণা। জীবনেব শেষপ্রান্তে তিনি বলেছিলেন, 'যে সকল কারিগব প্রকৃতির অবিকল নকল করে তারা চুরি করে প্রকৃতিব কাছ থেকে। এই ধৈর্য-নৈপুণ্য দেখেই যাবা বাহবা দেয় তারা মানব শিল্পের মর্যাদা বোঝে না।' শেষে যে তিনি প্রায় Abstract Expressionism-এর দিকে অনুরাগী হয়েছিলেন তা তাঁর কথায় ব্যক্ত হয়েছে পরিষ্কার—'বিষয়বস্তুহীন ছবিব নিছক বিশুদ্ধরূপ আমার ভালোই লাগে যেমন ভালো লাগে বাক্যহারা সংগীতের আলাপ। বস্তুত আমার নিজের ঝোঁক ঐ দিকে।' (১৩৪৬)

—'চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ'—চিন্তামণি কর; রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ, বার্ষিকী পৃঃ ২৪-২৭।

একালের জীবিত শিল্পীদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে আঁকতে দেখেছেন। চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের খুব কাছে থেকে তাঁর শিল্পচর্চা দেখেছেন আরেক আর্টিস্ট রামকিঙ্কর বেইজ। রামকিঙ্কর বেইজের বয়স এখন সত্তর-বাহাত্তর। দশ-বার বছর বয়সে

তিনি শান্তিনিকেতনে কবির সান্নিধ্য লাভ করেন। রামকিঙ্কর একাধারে চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর। বিশ্বভারতীর কলাভবনের অধ্যাপক। ইদানিং তিনি অবসর নিয়েছেন। কিন্তু ভাস্কর্যের কাজ করছেন নিয়মিত। শান্তিনিকেতনে গেলে দেখা যাবে রামকিঙ্করের অপরূপ সব ভাস্কর্য সৃষ্টি। দিল্লী, গৌহাটি আরও কত জায়গায় ছড়িয়ে আছে তাঁর ভাস্কর্যের কাজ। বহুকাল রামকিঙ্কর কবির পাশে থেকে কবির চিত্রকলার কাজ দেখেছেন। কবির চিত্রকলা সম্বন্ধে আমি যে সব প্রশ্ন রেখেছিলাম রামকিঙ্করের কাছে তার থেকে তুলে দিচ্ছি—

রামকিঙ্কর বেইজ বললেন, "রবীন্দ্রনাথ ছোট বেলায়ই আঁকতে শুরু করেন। পেনসিল কলম দিয়ে স্কেচ্ করতেন। তারপর কবিতার পাশে পাশে ছবি আঁকতেন। কবির বয়স যখন ষাট তখন ছবি আঁকা নিয়মিত ভাবে শুরু করেন। সত্তর থেকে আশী এই দশ বছরে কবি লেখালেখি একটু কমিয়ে ছবি আঁকাটা বাড়িয়ে দেন। গোড়ার দিকে অবনীন্দ্রনাথ ওকে আঁকায় উৎসাহ দিতেন। আমি যখন ছোট, বছর দশ-বার হবে তখন গুরুদেবকে ছবি আঁকতে দেখেছি।

প্রশ্ন: "রবীন্দ্রনাথ চিরাচরিত প্রথায় আঁকতেন না। অ্যাকাডেমিক্যাল নয় বলে অনেকে কবিকে আর্টিস্ট হিসেবে স্বীকার করতে চাননি। এটা কি সত্যি?

রামকিঙ্কর: "ওসব বাজে কথা। ও কিছু নয়। উনি শুধু শিল্পী নন, বড় দরের আর্টিস্ট। তবে তাঁর কিছু বিরুদ্ধ সমালোচক ছিল বৈকি! কোনো এক সমালোচক বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'ছবিতা'। এই বলে রামকিঙ্কর এক গাল হাসলেন।

"ইউরোপের আধুনিক আর্ট বা কিউবিজম্ ইত্যাদির প্রভাব ওঁর ওপর পড়েনি। গুরুদেব দেখে না ভেবে নিজের মনে কম্পোজিশান করে আঁকতেন। সেটা তাঁর নিজস্ব স্টাইল।

প্রশ্ন: "উনি কেন এত গাঢ় রঙ ব্যবহার করতেন?

রামকিঙ্কর : "পেলিক্যান কোম্পানী ওঁকে ল্যাকার কালার পাঠিয়ে দিত। উনি সেগুলো না মিশিয়ে, ঘন নীল এবং কাল রঙটা ব্যবহার করতেন। পেলিক্যান কোম্পানী গুরুদেবের জন্যে বিশেষ ধরনের কালি তৈরি করে পাঠাত। ওই রঙ জলে ভিজত না। ওটাই ছিল সুবিধে।

"ওঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। কবিতায় যা উনি প্রকাশ করতেন, তাই তিনি ছবিতে প্রকাশ করেছেন। কার্টিজ পেপারে আঁকতেন। রথীবাবু ওঁকে কাগজ এনে দিতেন।

প্রশ্ন : "রবীন্দ্রনাথ কি কখনো ভাস্কর্যের কাজ করেছেন ?

রামকিঙ্কর : "আমায় গুরুদেব কয়েকবার বলেছেন, 'আমায় একটু মাটি জোগাড় করে দাওতো। দেখি কিছু গড়া যায় কিনা।' আমায় যখন বলছেন তখন পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রতিমা দেবী। প্রতিমা দেবী আমায় বললেন, ওসব দিওনা। মাটি ঘাঁটলে ঠাণ্ডা লাগবে।

"আমি বললুম—তবে প্লাসটিসিন এনে দিই। প্রতিমা দেবী বললেন, —না, না ওসব এনো না। হাত চটচট্ করবে।"

ওই ঘটনা ঘটে কবির জীবনের শেষ অধ্যায়ে। তারপর আর হলনা। উনি তো চলেই গেলেন।

১৯৪১ সালে আমি কংক্রিটের সাঁওতাল মূর্তিটা করেছি। তারপর গুরুদেবের বাস্ট কাজে হাত দিয়েছি। উনি এসে দেখে উপদেশ দিয়েছিলেন—"যখন দেখবে, তখন বাঘের মতন করে দেখবে। বাঘের মতন ঘাড় মটকে ধরবে। যখন কাজ করবে তখন পিছনের দিকে তাকাবে না। এই উপদেশটা হল সব কাজের জন্যে। যে কোনো কাজ সিরিয়সলি করতে হলে চাই বাঘের মতন অদম্য ইচ্ছা আর একাগ্র চিন্তা। তাহলেই কাজ সফল হয়।"

বিশ্বভারতীর কলাভবনের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীদীনকর কৌশীক কবিগুরুর আদর্শ বজায় রেখে চলেছেন। কলাভবনে শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে কবি যা চেয়েছিলেন ঠিক সেই ভাবে এখনও কাজ চলছে। অধ্যক্ষ

দীনকর কৌশীক কলাভবনেব সঙ্গে জড়িয়ে আছেন কয়েক দশক ধরে। ববীন্দ্র-চিত্রকলাব সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পবিচিত অধ্যক্ষ কৌশীক। তাঁকেও প্রশ্ন করেছিলাম ববীন্দ্রনাথেব জীবদ্দশায় তাব ছবি এদেশে কেন বেশী কৌতূহল সৃষ্টি কবেনি। কেনই বা সে ছবিব স্বীকৃতি মেলেনি।

উত্তবে শ্রীকৌশীক বলেন (২২ জানুযাবা)—"কবিগুরু যে সময়ে ছবি আঁকা শুরু কবেন ঠিক সেই সময়ে বেঙ্গল বেনেশাঁস বা নবজাগবণেব দল যে পদ্ধতিতে ছবি আঁকত তা ছিল সুন্দবেব সন্ধান। সুন্দব কিছু আঁকাই ছিল সে যুগেব বেওযাজ। তাব বেড়া ভেঙ্গে ববীন্দ্রনাথ এমন স্টাইলে ছবি আঁকতে শুরু কবেন যা অন্যবা মানতে চাননি। আমাব মনে হয তিনি তখনই ত্রিশ বছব এগিযেছিলেন অন্যদেব চেযে। সেই কাবণেই তিনি তৎকালীন আর্টিস্টদেব কাছ থেকে উৎসাহ, প্রশংসা ও স্বীকৃতি পান নি। জনসাধাবণও তখনকাব দিনেব আধুনিক আর্টেব সঙ্গে অত পবিচিত ছিলেন না। তাঁবা ক্ল্যাসিক্যাল আর্ট এব ছবি দেখে অভ্যস্ত ছিলেন। এইসব কাবণেই বিশ-ত্রিশ দশকেব ববীন্দ্র চিত্রকলা তেমন সমাদৃত হযনি।"

১৯৬১ সালেব আগস্ট মাসে ববীন্দ্রনাথেব একুশটি চিত্রকলাব প্রদর্শনী হয কলাভবনে। এই প্রদর্শনী উপলক্ষে একটি ক্ষুদ্র ক্যাটালগ ছাপা হয সেই ক্যাটালগে অধ্যক্ষ কৌশীক ববীন্দ্র-চিত্রকলাব পবিচয দিতে গিযে বলেছেন—"পল ক্লী, ববীন্দ্রনাথ কিংবা মিবো-র মতন পাবণত চিত্রশিল্পী বা তাদেব ছবিব ওপব পূর্ণ সংযম বজায বেখেছেন। তিনি যা চেযেছেন তাই সৃষ্টি কবেছেন, হযত যুক্তিপূর্ণভাবে নয কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে। আলো-ছাযাব খেলাব মাধ্যমে শিল্পী যা এঁকেছেন তা বলিষ্ঠ মনেব পবিচাযক। চেতন ও অবচেতন মনের সৌন্দর্য সৃষ্টি যা কবেছেন তা সমতা বজায বেখেছে। যাই তিনি এঁকেছেন সবই সংস্কৃতি মনেব ছাপ বেখে গেছে, রেখে গেছে তাব সক্রিয়তা।"

কলাভবনের একটি আলোচনা সভায় অধ্যক্ষ কৌশীক ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বলেছিলেন—"আমি এমন একজন চিত্রশিল্পীকে জানি যিনি পেশায় শিল্পী ছিলেন না। যিনি ছিলেন আধুনিক আর্টিস্ট কিন্তু তিনি চিরাচরিত অথবা অধুনিক প্রথার ওপর খুব বেশী আস্থা রাখতেন না। তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে আধুনিক এবং জন্ম থেকেই চিত্রশিল্পী। যিনি সাতষট্টি বছর বয়সে ছবি আঁকার কাজে মগ্ন হন, তাঁকে কোনো দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলা যায় না।

"এই শিল্পী শান্তিনিকেতনে বাস করেছেন এবং কাজ করেছেন। অবনীন্দ্রনাথের নবজাগরণ আন্দোলন এবং নন্দলাল বসু ও তাঁর ছাত্রদের কাজ দেখেছেন। তাঁদের আন্দোলন ও কাজে উৎসাহ দিয়েছেন তিনি। কিন্তু তিনি নিজে যা এঁকেছেন তার সবটাই ছিল উপরোক্ত আন্দোলন ও কাজের থেকে স্বতন্ত্র ও বিচিত্র। তাঁর অঙ্কন পদ্ধতিটি ছিল আধুনিক আর্টের দিকে আবিষ্কারের পদক্ষেপ। এই শিল্পী হলেন রবীন্দ্রনাথ।"

যাঁরা আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল তাঁদের কাছে শিল্পী সোমনাথ হোড় পরিচিত। সোমনাথ হোড় শুধু কলাভবনের গ্রাফিক আর্টের অধ্যাপক নন। তিনি গ্রাফিক আর্টে জনপ্রিয় আর্টিস্ট। দেশে এবং বিদেশে আর্ট চর্চা করেছেন, দিল্লী-কলকাতায় শিক্ষকতা করেছেন এবং তাঁর ছবির বহু প্রদর্শনী হয়েছে। রবীন্দ্র-চিত্রকলা সম্বন্ধে অধ্যাপক হোড় কি ভাবেন সেই প্রশ্ন করেছিলাম তাঁকে (২২ জানুয়ারী) । উত্তরে অধ্যাপক হোড় বলেছিলেন—"যখন কলকাতায় আর্ট কলেজের ছাত্র ছিলাম তখন অনেক কিছুই ভাবতাম রবীন্দ্র-চিত্রকলা সম্বন্ধে। এখন দেখছি রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আঁকা ছবির পর্যায়ে পড়ে।"

তখনকার দিনে আর্টিস্টরা ন্যাচারালইজম্ বা কপি করতেন। তার বাইরে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সম্ভবত এই কারণে তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে সেকালে আর্টিস্ট বলে মেনে নিতে পারেন নি। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য

এই দুয়ের কোনো নিয়মমাফিক ছবি আঁকেন নি বলেও খানিকটা কারণ ছিল। জনসাধারণ তখনকার দিনে মডার্ন আর্ট সম্বন্ধে সচেতন বা ট্রেণ্ড্ ছিলেন না বলে তারা কবির ছবিগুলো তারিফ করতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব স্টাইলে ছবি আঁকতেন বলে অনেকেই তাঁর স্টাইল ধরতে পারতেন না। সম্ভবত এইসব কারণে তখনকার দিনে অনেকেই বিরূপ মন্তব্য করতেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন নতুন স্টাইলে ছবি আঁকছেন ঠিক সেই সময়ে শান্তিনিকেতনে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত কলাভবনে তখন চলছে ক্ল্যাসিক্যাল স্টাইলে ছবি আঁকা। এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার। সেই সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন মতবাদের প্রভাব কলাভবনে প্রভাব-বিস্তার করতে পারেনি। কেউ কেউ বলেন, সে যুগের পল ক্লী, কানদিনস্কি, মিরো, মুঙ্ক-এর ছবির প্রভাব বা ওই জাতায় ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ। এখন এই সত্তর দশকের ভাবতে ইজম্ওয়ালা আর্ট তো জলভাত। এই ধরনের স্টাইলে ছবি আঁকা শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ বিশ-ত্রিশ দশকে।

বহু বিখ্যাত ভারতীয় আর্টিস্ট যাঁরা শতবর্ষ পূরণ করেছেন তাঁদের বেশ কিছু ছবির রঙ এখনই মলিন হয়ে এসেছে। তার কারণ তাঁরা নানা রঙ মিশিয়ে ছবি আঁকতেন। রবীন্দ্রনাথের বেলায় তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ সব সময়েই মেশানো রঙ ব্যবহার না করে, এক-একটি রঙ নির্ভেজাল ভাবে পরিবেশন করেছেন বলে অতি সাধারণ কাগজের ওপর আঁকা ছবির রঙ এখনও অটুট রয়েছে। সব রঙই জীবন্ত বলে মনে হয়। বড় বড় শিল্পীর মতন ভাল কাগজ বা ক্যানভাস ব্যবহার করেননি রবীন্দ্রনাথ। সাধারণ কাগজের ওপর নির্ভেজাল রঙ ব্যবহার করেছেন বলে ছবির রঙগুলো এখনও মলিন হয়নি। রবীন্দ্র-চিত্রকলার এটাও একটা বৈশিষ্ট্য।

সাধারণের চোখে রবীন্দ্র-চিত্রকলা

আধুনিক আর্টের ইজমের গোলক-ধাঁধায় সাধারণ দর্শক হয়ত হারিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু ছবি এত সহজ ও সাধারণ যে কোনো ইজমে অনভিজ্ঞ সাধারণ শিল্প-রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য। বহু রবীন্দ্র-সাহিত্য রসিকের পক্ষে সব রবীন্দ্র-চিত্রকলা দেখা সম্ভব নয়। তার কারণ অধিকাংশ ছবিই রক্ষিত আছে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে, কলাভবনে, কলকাতায় রবীন্দ্রভারতীর প্রদর্শনশালায় এবং অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে দুটো বইয়ের পাতায় পাতায় বহু ছবি এঁকেছেন। এই ছবিগুলো সহজবোধ্য। কোনো ইজমের মার প্যাঁচ নেই। প্রথম বই 'খাপ-ছাড়া' প্রকাশিত হয় মাঘ ১৩৪৩ সালে। কবি বইটিকে উৎসর্গ করেন শ্রীরাজশেখর বসুকে। 'খাপছাড়া' বইটির প্রতি পাতায় ছড়ার সঙ্গে একটি করে ছবি। ছড়ার বিষয় বস্তু তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন প্রতিটি ছবিতে অতি নিখুঁত ভাবে। কবির হাতে ছবি এবং ছড়া যেন মণি-কাঞ্চনের মিলন ঘটেছে। বিশ্বের আর কোনো বিখ্যাত কবির হাত দিয়ে এমন একখানা বই বেরিয়েছে বলে আমার তো চোখে পড়েনি। 'খাপছাড়া'য় আছে সব শুদ্ধ বাহাত্তরটি ছবি। অধিকাংশই পেনসিল ও কলমের স্কেচ্। আর আছে কিছু প্যাস্টেলের আঁকা ছবি। 'খাপছাড়ার' ছবি ও ছড়া ছেলে-বুড়ো সবার জন্যে।

'খাপছাড়া'র পরে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি সম্বন্ধে 'সে' বইটি প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ সালের বৈশাখ মাসে। 'সে' বইটি উৎসর্গ করেন তিনি শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে। কাহিনীর সঙ্গে ছবির শোভা চলেছে বইটিতে। 'সে' বইয়ের সূচনায় তিনি বলেন, "বিধাতা লক্ষ লক্ষ

কোটি কোটি মানুষ সৃষ্টি করে চলেছেন, তবু মানুষের আশা মেটে না; বলে আমরা নিজে মানুষ তৈরি করব।...

"নাতনির ফরমাসে কিছুদিন থেকে লেগেছি মানুষ গড়ার কাজে; নিছক খেলার মানুষ, সত্যি মিথ্যের কোনো জবাবদিহি নেই। গল্প যে শুনছে তার বয়স ন' বছর, আর যে শোনাচ্ছে সে সত্তর পেরিয়ে গেছে।"

'খাপছাড়া'র মতন 'সে' বইয়ের পাতায় পাতায় অবশ্য ছবি নেই। তবে নেহাৎ কম নয়। বহু অদ্ভুত চেহারার জীব আছে ওই বইয়ে।

রবীন্দ্রনাথের বহু ছবি অতি সাধারণ এবং সাধারণের জন্যে। এই ধরনের ছবি সম্বন্ধে কবি একটি কবিতাই লিখে ফেলেছেন। তাঁর 'ছবি আঁকিয়ে' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে—

"ছেঁড়া খোঁড়া মোর পুরানো খাতায়
ছবি আঁকি আমি যা আসে মাথায়
যখনই ছুটি পাই।
বঙ্কিমমামা বুঝিতে পারে না—
বলে যে, কিছুই যায় না তো চেনা;
বলে কী হয়েছে ছাই।
আমি বলি তারে, এই তো ভালুক,
এই দেখো কালো বাঁদরের মুখ,
এই দেখো লাল ঘোড়া—
রাজপুত্তুর কাল ভোর হলে
দণ্ডকবনে যাবেন যে চলে—
রথে হবে ওরে জোড়া।
উঁচু হয়ে আছে এই যে পাহাড়
খোঁচা খোঁচা গায়ে ওঠে বাঁশ-ঝাড়
হেথা সিংহের বাসা
এঁকে বেঁকে দেখো এই নদী চলে।

নৌকা এঁকেছি ভেসে যায় জলে,
ডাঙ্গা দিয়ে যায় চাষা।
ঘাট থেকে জল এনেছে ঘড়ায়—
শিবঠাকুরের রান্না চড়ায়
তিন কন্যা যে এই।
সাদা কাগজের চর করে ধূ-ধূ
সাদা হাঁস দুটো বসে আছে শুধু
কেউ কোথাও নেই।
গোল করে আঁকা এই দেখো দেখি,
সূর্যের ছবি ঠিক হয়নি কি,
মেঘ এই দাগ যত।
শুধু কালী লেপা দেখেছ এ পাতে—
আঁধার হয়েছে এই খানটাতে,
ঠিক সন্ধ্যের মতো।
আমি তো স্পষ্ট দেখি সবকিছু
শালবন দেখো এই উঁচু নিচু
মাছগুলো দেখো জলে।
'ছবি দেখিতে কি পায় সব লোকে—
দোষ আছে তোর মামারই দু'চোখে'
বাবা এই কথা বলে।"

রবীন্দ্র-চিত্রকলা যাঁরা না বোঝার ভাণ করেন তাঁদের কথা আমি এখানে টানতে চাই না। 'খাপছাড়া' ও 'সে' বইয়ের স্কেচ্‌গুলো ছাড়া আরও বিস্তর স্কেচ্ এঁকেছেন কবি। সেগুলোর রেখাঙ্কনে রাবীন্দ্রিক স্বকীয়তা ফুটে উঠেছে। যাঁরা আর্টের ইজম্ বোঝেন না, তাঁরা যদি একটু মন দিয়ে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন রেখাঙ্কনে বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অতি সহজ ও সরল রেখায় ছবির ভাষা ব্যক্ত হয়েছে। ওর মধ্যে কোনো ইজমের প্যাঁচ নেই। কবির সরল প্রকৃতি ওতে

ফুটে উঠেছে। চোখে লাগে না। রঙের ব্যবহারেও তাই; ভেজালের কারবার নেই। যার যা রঙ হওয়া উচিত; সেখানে সেই খাঁটি রঙ দিয়েছেন, সুতরাং সব দিক দিয়ে বিচার করলে সাধারণ আর্ট-রসিকের কাছে রবীন্দ্র-চিত্রকলা দুর্বোধ্য নয় বরং বলব সহজই।

রবীন্দ্র-চিত্রকলায় রেখা সম্বন্ধে বলেছেন, কবি তাঁর একটি চিঠিতে সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে—

"কল্যাণীয়েষু

অনেকদিন কাটিয়েছি একান্তভাবে কথার সাধনায়, এখন পড়েছি রেখার মায়াজালে জড়িয়ে। কথার দাবী বেশি, কেননা, সে ধনী-ঘরের পাত্রীর মতো অর্থ সঙ্গে করেই আনে, সেই মুখরার মন রাখতে অনেক চিন্তা করতে হয়। রেখা অপ্রগল্‌ভা এবং অর্থহীনা, তার সঙ্গে বিশুদ্ধ লীলা সম্পূর্ণ অনর্থক ব্যবহার। গাছের মাথায় ফুল ফোটানো, ফল ধরানো সে এক ব্যাপার, আর গাছের তলায় আলোছায়ার নাট বসানো সে আরেক কাণ্ড—সেইখানেই ঝিল্লি ডাকে, প্রজাপতি ওড়ে, রাতের বেলা জোনাকি ঝিক্‌মিক্ করে। বনের আসবে এরা সব হাল্কা চালের দল, কোনো দায়িত্ব নেই। আমার রেখার লীলা এই জাতের, যদি সত্যিকার বড়ো আর্টিস্ট হতুম তাহলে লেখনীর এমন লক্ষ্মীছাড়াগিরি চলত না। এখন আমার মন এই রেখার খেলায় মুক্তি খোঁজে, তখন খুঁজত সিদ্ধি। কথা আমাকে প্রশ্রয় দেয় না। তার কঠিন শাসন—রেখা আমার যথেচ্ছাচারে হাসে, খুব বেশী প্রতিবাদ করে না—তার ফল হয়েছে এখন এই আঁকজোক কাটা ছাড়া আর কিছুতে আমার মন যায় না। কাজকর্ম পড়ে থাকে; চিঠিপত্র হারিয়ে ফেলি, একটু ফাঁক পেলেই ছুটে যাই রেখার অন্দর মহলে; ভিতরে যে দায়িত্ববোধ-হীন বালকটা লুকিয়ে আছে তার সাহস বেড়ে গিয়েছে।"

১৬ কার্তিক ১৩৩৫ ইতি—

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনে কত ছবি এঁকেছিলেন তার কোন সঠিক হিসেব পাওয়া যায় না। মনে হয় তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার ছবি হবে। কারণ বিদেশে তিনি বহু ছবি বিলি করেছেন। বেশ কিছু বিদেশে বিক্রি হয়েছে। আর দেশেও তিনি অনেককে তাঁর ছবি উপহার দিয়েছেন। সেগুলো এখন বহু ব্যক্তির সংগ্রহে আছে। তার হিসেব পাওয়া মুসকিল।

এখন বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে আছে এক হাজার পাঁচশ তেষট্টিটি ছবি। কলাভবনে আছে ত্রিশটি। রবীন্দ্রভারতীর প্রদর্শনশালায় সংরক্ষিত আছে ছেচল্লিশটি ছবি। কলকাতার অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের প্রদর্শনশালায় আছে পঁয়ত্রিশখানা ছবি।

শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবন নির্মাণের পর কবির আঁকা ছবিগুলো শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে স্বযত্নে রাখা হয়েছে। কিন্তু ১৯৪১ থেকে ১৯৬১ এই ক'বছর ছবিগুলো অতি সাধারণভাবে রাখা হয়েছিল। ফলে পঞ্চাশটির বেশী ছবিতে পোকায় কাটে ও ছাতা ধরে। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর পর থেকে ছবিগুলোর প্রভূত যত্ন নেওয়া হয়েছে।

বিশ্বভারতীর সংগ্রহশালা সব ছবির সাদা-কালো ফিল্মে তুলেছেন। পাঁচশটি ছবি রঙ্গীন ফিল্মে তুলেছেন। আর চল্লিশটি ছবি তোলা হয়েছে কোলোটাইপ রিপ্রোডাকশনে। কিন্তু রবীন্দ্র-চিত্রকলার কোনো রঙ্গীন চলচ্চিত্র তোলা হয়নি।

রবীন্দ্র-চিত্রকলার দুই খণ্ডে 'চিত্রলিপি' প্রকাশ করেছেন বিশ্বভারতী। শতবার্ষিকীতে দিল্লীর ললিতকলা অ্যাকাডেমি একটি সুদৃশ্য বড় বই প্রকাশ করেন। এর বাইরে রবীন্দ্র-চিত্রকলার কোনো জনপ্রিয় বই নেই। রবীন্দ্র-চিত্রকলা জনপ্রিয় করার জন্য ১৯৫৬-৫৭ সালে তৎকালীন বিশ্বভারতীর উপাচার্য স্বর্গত অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু চেষ্টা করেছিলেন কিছু কিছু ছবি রঙ্গীন পোস্টকার্ডে ছেপে প্রকাশ করতে। ওই প্রস্তাবে স্বয়ং পণ্ডিত নেহেরুজীও রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক পরে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে

স্বল্পমূল্যে কিছু ছবির বই ছাপার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

সবচেয়ে যা একান্ত প্রয়োজন তাহল রবীন্দ্র-চিত্রকলার ব্যাখ্যা ও ছবি সমেত একটি ক্যাটালগ। এই ধরনের ক্যাটালগ ছাপা হলে রবীন্দ্র-চিত্রকলা সম্বন্ধে অন্তত ভাসা-ভাসা জ্ঞান হতে পাবে জন-সাধারণের। কেন্দ্রীয় সরকারেব শিক্ষাদপ্তর, ইউ. জি. সি. গ্র্যান্ট ইত্যাদি বহু দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ ছাপাব ভাব নেন। রবীন্দ্র-চিত্রকলার ক্যাটালগ ছাপার ভার নিন না। এবিষযে জাতি সংঘেব সংস্কৃত দপ্তব 'ইউনেস্কো' (UNESCO) বহু দেশে অনুদান দিয়ে থাকে। তাদের জানালে তাবা আগ্রহ নিয়ে এগিযে আসবে।

রবীন্দ্র-চিত্রকলার নামে যে বইটি বিতর্কের ঝড় তুলেছিল

আমাদের দেশে অনেক ঐতিহ্যের মধ্যে একটি ঐতিহ্য বহু শতাব্দী ধরে অতি সুষ্ঠভাবে পালিত হয়ে আসছে। সেটি হল এই যখনই কোনো ব্যক্তি সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প বা রাজনীতির জনপ্রিয়তার চরম শিখরে ওঠেন, তখনই সেই ব্যক্তির নাম ভাঙ্গিয়ে সমাজের বেশ কিছু লোক ব্যবসায়ে নামেন এবং সেই জনপ্রিয় ব্যক্তির নাম ভাঙ্গিয়ে বেশ পয়সা রোজগার করেন। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় বহুবার এমনি ঘটনা ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথ যখন ছবি আঁকায় মশগুল কিন্তু এদেশে তেমন জনপ্রিয়তা আসে নি, তখন রবীন্দ্রনাথের নাম করে একটি ছবির বই প্রকাশিত হয়। বইটিতে ছিল মডেলদের ফটোগ্রাফ আব প্রতিটি ফটোগ্রাফের নিচে ববীন্দ্রনাথের একটি করে কবিতা। ওই বইটিতে ব্যবহৃত ছবিগুলোব সঙ্গে ববীন্দ্রনাথের কোনো সম্পর্ক নেই। ববীন্দ্র-নাথের আঁকাও নয়। কিন্তু বইটিতে রবীন্দ্রনাথের নাম ব্যবহারে কি কবে বিশ্বভারতীর অনুমতি লাভ কবেছিল তা এখনও গবেষণাব বিষয় হয়ে রযেছে। বইটি প্রকাশেব পর রবীন্দ্রনাথ ভীষণ মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

সেকালের চিত্রশিল্পেব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন লাহা পরিবারের শ্রীভবানী-চরণ লাহা। সে যুগেব চিত্রশিল্পীদের অনেকেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আর্টিস্টদের কাজের সুবিধের জন্য শ্রীভবনীচরণ লাহা মডেলদের নিয়ে একটি অ্যালবাম প্রকাশ করেন ১৯২৬ সালে। বইটি প্রকাশিত হয় বসুমতী সাহিত্যমন্দির থেকে। এই বইটির নাম 'শোভা'। সবশুদ্ধ একশ চারটি মডেলেব ছবি আছে। প্রতিটি ছবির নিচে রবীন্দ্রনাথের কবিতার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত কবা হয়েছে এবং বইটির প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা আছে 'কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত ববীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা-মাধুরী-সম্বলিত সম্মোহন চিত্র-অ্যালবাম।' শ্রীভবানীচরণ লাহা-দ্বারা সঙ্কলিত

সুসজ্জিত হয় বইটি। এই বইয়ের নিবেদনে শ্রীভবানীচরণ লাহা লিখেছেন—"চারু-চিত্রকলার সেবায় অবসর বিনোদনের জন্য—বিভিন্ন মডেলের বিভিন্ন ভঙ্গীর কতকগুলি ফটো লইতেছিলাম। তখন কল্পনা ছিল, অবসর মত এগুলির সাহায্যে চিত্র অঙ্কিত করিব। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একদিন সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া ফটো-চিত্রের অ্যালবামখানি দেখেন এবং ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য উৎসাহিত করেন। তাঁহারই আগ্রহে, তাঁহারই প্রদত্ত 'শোভা' নামে তাঁহারই ব্যয়ে ও আয়োজনে, তাঁহারই পরামর্শ মত বিশ্বভারতী হইতে অনুমতি লইয়া বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কবিতা পারিজাত-মাধুরী সমাবেশে ইহা সুশোভিত করিয়াছি। এখন ভরসা হয়, সৌন্দর্যোপভোগেচ্ছু শিল্পামোদী সমাজে, শিক্ষিত সমাজে 'শোভার' শোভা সমাদৃত হইবে। প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দেব বিশেষ যত্নে কবিতাগুলি নির্বাচিত করিয়া ছবির সহিত সুসঙ্গত করিয়া মিলাইয়া দিয়াছেন—এজন্য তাঁহার নিকট আমি উপকৃত। নবীন শিল্পী শ্রীমান সত্যচরণ ঘোষ ফটো লইবার সময় আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। যাঁহারা চারু-চিত্রকলার সেবা করেন, এ সকল আদর্শ তাঁহাদের উপকারে আসিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়।"

'শোভা' বইটি সেযুগে বিতর্কের ঝড় তোলে। বইটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম জড়িয়ে ছিল বলেই। ওই বইটি সম্পর্কে পরে কবি দুঃখ করে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে একটি চিঠি লিখেছিলেন—

"কল্যাণীয়েষু,

……ভবানীচরণ লাহা আমার রচিত পদগুলিকে তার তুলির পঙ্কে কলঙ্কিত করেচে এটা আমার পক্ষে লজ্জার কারণ। লোকে জানবেই না যে এতে আমার সম্মতি ছিল না।……"

ইতি ১৪ ভাদ্র ১৩৩৫

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'শোভা' বইটিতে রবীন্দ্রনাথের নাম জড়ান না হলে বইটি চিত্র-শিল্পীদের কাজে উপযোগী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে যুগে আর্টিস্টদের জন্য আমাদের দেশের আর্ট কলেজে বা স্টুডিওতে মডেলের তেমন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু আর্টিস্টদের পক্ষে মডেল একান্তই প্রয়োজন। সেদিক দিয়ে ওই বইটি আর্টিস্টদের অনেক অভাব পূরণ ক'রে থাকতে পাবে। অবশ্য একালে আর্ট কলেজে ও স্টুডিওতে মডেল রাখার নিয়ম হয়েছে। ইউরোপে এই ব্যবস্থা চালু আছে বহুকাল ধরে।

রবীন্দ্রনাথ বহু সময়ে তাঁর সামনে যাকে পেয়েছেন তাকে দেখে কিছু স্কেচ্ এঁকেছেন। শোনা যায় একবার তিনি শ্রীমতী রাণী চন্দকে বলেছিলেন, 'বোস তোর একটি ছবি আঁকি।' এমনি তিনি শেষ বয়সে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীকেও বলেছিলেন। তখন তিনি কালিম্পঙে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে অতিথি। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী কবির কথা যা লিপিবদ্ধ কবেছিলেন তা থেকে তুলে দিচ্ছি—

"····তুমি বোসো, তোমাব একটা ছবি আঁকা যাক। ভাগিাস শেষজীবনে এই দেবী আমায় ধবা দিলেন। জীবনের একটা নতুন পর্ব রচনা হোলো। নতুন রকম ক'বে জগৎকে দেখলুম আর্টিস্টের চোখ দিয়ে। আমার ছবি এদেশকে দেখাই নি। এখানে অধিকাংশ লোকই ছবি দেখতে জানে না, প্রথমেই দেখে এব চেহাবাটা ভালো দেখতে কি না। দেখতে হয় এটা ছবি হয়েছে কি না. সে দেখা কেমন ক'বে দেখা তা বুঝিয়ে দেওয়া যায় না। একটা নিয়ত অভ্যাস আব instinctive দৃষ্টি থাকা চাই: ছবি দেখা সকলের কাজ নয়। সে জন্যেই আমি এখানে ছবি প্রকাশ কবতে চাইনে. প্যারিসে ওরা দেখেছিল আমাব ছবি, দেখবার মত কবে। আমার ছবি এদেশের জন্যে নয়।"

—'মংপুতে ববীন্দ্রনাথ', মৈত্রেয়ী দেবী, ১৩৬৪ পৃঃ ১৩২

———